আদি গঙ্গার এপারে

শান্তিময় ঘোষাল

সুপ্রীম বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স
১০এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

রথযাত্রা ১৩৭১

প্রচ্ছদ

জয়ন্ত ঘোষ

নমিতা ঘোষাল

কলকাতা ৭০০০২৭

প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব

মধুসূদন বাগচী

শ্রীপঞ্চমী প্রেস

৯ মানিকতলা লেন

কলকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রিত।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

'বল হরি-হরিবোল !'

এখানেই নামিয়ে রাখ। আমি ডেথ্‌সার্টিফিকেট জমা দিয়ে আসি। দীপু, তুই ঝন্টুর বাবাকে সামাল দে। গোরা অন্ধকার গলিটার বাঁকে হারিয়ে গেল ; ওকে আর দেখা গেল না।

জীবন মড়াটার পাশে বসে আছে নিথর হয়ে, ওর চোখের পলক পড়ছে না ; জল নেই একটুও। কাঁদছে না কিছুতেই। ও যেন একটা পাষাণ ফলক।

দীপু জীবনের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের শান-বাঁধান দালানটায় বসাল। বললে, জীবনদা, ঝন্টু চলে গেল, তুমি অমন করে বসে থেকো না। একটু কাঁদ ! কিছু বল ! সংসারটা তোমার উপরই নির্ভর করছে। তুমি না থাকলে সংসারের হাল ধরবে কে ?

জীবন দীপুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কথা বলে না।

গোরা ফিরে আসে : বলে, ডোমের পাত্তা নেই, ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল, ডেকে তুলেছি। চা খেয়ে আসছে। কি-রে ! জীবনদা এখনও চুপচাপ ?

গোরা জীবনকে জোরে একটা ঝাঁকানি দেয়, জীবনদা একটু কাঁদ, তোমার ছেলে মরেছে, আর তুমি একটু কাঁদবে না ; এ তো হ'তে পারে না।

জীবন গোরার দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখে জল। জল ঝরছে অঝোরে। আমার যে আর কেউ নেইরে। জীবন কথা বলে।

আমরা আছি, তোমার ছেলে, গোরা জবাব দেয়।

দীপু বলে, ক'দিন আছি জানি না জীবনদা ; আমাদেরও যেতে হবে।

জীবন দীপুকে জড়িয়ে ধরে ; ওর কান্না আর থামে না।

গোরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ডাক্তার এসেছে টর্চ নিয়ে। শালাদের রাজত্বে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। নে, কাপড়টা সরা। লাশটা একবার দেখে যাই।

গোরা ঝন্টুর উপর চাপা দেওয়া এক চিলতে কাপড় সরিয়ে দেয়।

ডাক্তার চমকে ওঠে, বুকটা একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ভগবান! আর কত দিন! আর যে পারি না, তুমি নেই! নেই এটাই সত্যি। ডোমটা গেল কোথা? শালা চুল্লু খেয়েই মরবে।

ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

নিকষ কালো অন্ধকার! দীপু খাটিয়ার পাশে বসে আছে। কারেন্ট নেই। ল্যামপোষ্টের ডগায় ঝোলান বাতিটা জ্বলছে না।

জীবন দালানে। ওর চোখের জল আবার শুকিয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টি মেলে ও এই জমাট অন্ধকারে কি যে দেখছে বোঝা গেল না।

গোরা একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

দীপু বললে, শেষ করার আগে একবার দিবি। যা ঠাণ্ডা এক ছিলিম গাঁজা পেলে মন্দ হত না।

গোরা গর্জে উঠে, গুলি খাওয়ার চেয়ে গাঁজা খেয়ে মরলে হয়ত স্বর্গে যেতুম। ধূমায়িত ক্ষোভ ওর গলায়।

দীপু প্রতিবাদ জানায়, গাঁজা যদি খেতে হয়, আগেই শুরু করলে পারতিস, দেশোদ্ধারের স্বপ্ন না দেখে গাঁজা খেয়ে মেয়ে মানুষের স্বপ্ন দেখতিস। স্বগ্য থেকে পরীরা নেমে আসত।

আপনাদের ম্যানেজার কে? পঞ্চাশটা টাকা ছাড়ুন, ইলেক্‌ট্রিক চুলি বন্ধ, কাঠ আনতে হবে, বলতে বলতে রামসেবক এসে উপস্থিত। ওর পাজুটো টলছে।

পঞ্চাশ টাকা কি হবে? গোরা প্রশ্ন তোলে।

হিসেব দিতে পারব না। খুশি হয় দিন, না হলে লাশ এখানেই রইল, আমি চললুম। রামসেবক চলতে শুরু করেছে।

গোরা ছুটে গিয়ে রামসেবককে ডেকে আনে; বলে, আয় বাবা উদ্ধার কর, আর কখনও হিসেব চাইব না।

দীপু হিপ্‌পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে রামসেবকের হাতে দেয়।

এবার রাম: জীবনের পাশে জাঁকিয়ে বসে; বলে, শুনুন, হিসেব এখন দেব; আগে হিসেব চাইলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাঠ সাতাশ টাকা, তিন টাকা কুলীকে দিতে হবে; আর আমার কুড়ি টাকা। জবাকে একটা টিকলি গড়িয়ে দিতে হবে। জবা মেয়েটা সত্যিই ভাল; ওকে না দেখলে আমি মরে যাব। ওর চুল্লুতে ভেজাল নেই। ঐ চুল্লু খেলে কেউ মরে না। আজকাল সবেতেই ভেজাল। এইতো ওই বাঁকটার মুখে, তিন গ্লাস খেলেও নেশা হবে না। আর জবার এক গ্লাসেই মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে হবে শরীরটা হাল্কা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে উড়েও বেড়ান যায়।

গোরা বিরক্ত হ'য়ে মোলায়েম কণ্ঠে বললে, বাবা তোমার জবার চুল্লুর গপ্পো পরে শুনবো; মাল হাতে এসে গেছে, এবার কাঠ এনে ঝাট্ দিয়ে দাও; সকালের মধ্যে বাড়ী পেঁ াছতে হবে; থানায় হাজিরে দিয়ে দুপুরে কোর্টে। ঝামেলার শেষ নেই। উদ্ধার কর বাবা।

রামসেবক গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠল।

অন্ধকারটা জমাট বেঁধে আছে। আদি গঙ্গার ওপারে একটা আলো জ্বলছে টিমটিম করে। লম্বা থামের উপর নাইটল্যাম্পের আলোর মতন একটু ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে এখানের অন্ধকারকে আরও ভূতুড়ে করে তুলেছে।

একটু পরেই রাম পা টেনে টেনে এগিয়ে এলো। সঙ্গে একটা আধপাগলা ধরনের লোক, ও কাঠ নিয়ে এসেছে। বামুন কতকগুলো পাঁকাটি সঙ্গে এনেছে।

রামসেবক আর ওই আধপাগলা লোকটা মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে চুলি সাজিয়ে দিলে। বামুন বললে, লাশ তুলে আনুন। আত্মীয় কে আছে? উঠে আসুন, বলুন,—

"ওঁ গয়াদিনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বারাঃ॥

কৌশিকীং চন্দ্র ভাগাঞ্চ সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনীং।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডকীং সরযূং পনসং তথা ॥
বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথা ॥"

পাঁকাটি জ্বলে উঠল। জীবন মুড়িপোড়া বামুনের পেছু পেছু ঘুরতে লাগল। দাহ শুরু হয়ে গেল।

জীবনের পাশে এসে বসল দীপু।

জীবন পাষাণ হয়ে গেছে। অহল্যার মতন। শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে জ্বলন্ত শবদেহের দিকে। দেখতে দেখতে দেহটা মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে।

জীবন মনে মনে স্বস্তি পায়। যাক ঝামেলা মিটল, ছেলের জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। রাত জেগে বসে থাকতে হবে না। ছেলে এলো কি এলো না—সে ভাবনা আর রইল না। দেশের কাজ না ছাই! কেন যে জন্মেছিল। দুদিনের সংসার। বৌ গেল, ছেলে গেল; কিছুদিন হাত-পা নেড়ে খেলা করল। বাংলা স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়ল। জীবনের চাকরিটা এখনও আছে। ছেলে তো বেকার ছিল। বড়বাবুকে ছেলেটার চাকরির জন্যে বলে রেখেছিল বৃথাই। অনেক তেল খরচ করেছিল গত সাত বছর ধরে।

'বল হরি হরি বোল'—ওরা ফিরে এলো শবদাহ করে। পুব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠবে একটু পরেই। পাড়ার সবাই ঘুমুচ্ছে।

জীবন ফিরে এলো মাথা নীচু করে। বৌদি নিমপাতা, চাল দরজার বাইরে জমা করে রেখেছিল। দীপু-খোকা-শম্ভু একটু করে মুখে দিয়ে চলে গেল।

জীবন খোলা দরজার পাশটায় বসে পড়ল। ক্লান্তি নেমে এসেছে ওর দুচোখ বেয়ে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে; হাত-পা অবশ। জীবন মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

বৌদি বলে, ঠাকুর-পো ভেতরে এস, এখনও সকাল হয়নি।

জীবন মেঝেতে শুয়ে বৌদির দিকে চাইল।
বৌদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে গেল।
জীবন নির্বাক। ও ভাবে, ঈশ্বর ওর জন্যে তো ঘর রাখেনি
জীবন ঘুমিয়ে পড়ে। দরজা হাট করে খোলা।

দুই

দেশবন্ধুর সমাধি-মন্দিরটার গা বেয়ে সূর্য উঠছে। ধোঁয়ার কস্‌-লাগান চুড়োটা পোড়ামাটির রাধানাথজীর মন্দিরের চুড়োটার মত দেখাচ্ছে। আদি গঙ্গার পচা জল সকালের মিষ্টি হাওয়াকেও বিষিয়ে রেখেছে। ছড়ান ছেটান জঞ্জালে একপাল মাছির শব্দে ভরে থাকে প্রভাতের বিষণ্ণ সময়; রাতের কিনারা পেরিয়ে বিমর্ষ একটা পাখি ক্ষিপ্ত ডানা ঝাড়ে। উরুক্রম মঠের লাল তিনকোণা পতাকাটা বাঁশের ডগায় ঝুলছে। বন্ধ দরজার বাইরের চাতালে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রামসেবক। একটু আগেই ওর রাত ডিউটি শেষ হয়েছে। কস বেয়ে লালা ঝরছে। চোলাই বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খোয়াড়ি কাটেনি একটুও। মঠের কর্তা এখনও দরজা খোলেনি। শ্মশানে জলে ভেজা পোড়া কাঠের ধোঁয়া ধুঁকে ধুঁকে উঠছে।

রাস্তায় সারারাত পড়ে থাকা প্রাইভেট বাসটা হর্ণ দিচ্ছে। ড্রাইভার কনডাকটারকে ডেকে তুলছে হর্ন বাজিয়ে। এ-পাড়ার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে বাসটা। মঠের কর্তা দরজা খুললো। ময়লা গেরুয়া কাপড়টা লুঙ্গির মতন জড়ান।

সন্ন্যাসী বললে, রোজ সকালে উঠেই ডোমের মুখ দেখতে হবে। চুল্লু খেয়ে এখানেই পড়ে থাকবে। শালার মরার আর জায়গা নেই। এই রামসেবক, শালা উঠে পড়। সকাল হয়েছে।

রামসেবক পাশ ফিরল চোখ বন্ধ রেখেই। গুরুর কথা ওর কানে ঢুকলো না।

সূর্যটা সমাধি মন্দিরের চুড়ো ছাড়িয়ে, হাত পাঁচেক উপরে উঠে গেছে। চুলোর ধোঁয়াটা আর দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গার জলে একটা কুকুর ভাসছে। কুকুরের দেহটা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে। পা দুটো টানটান সোজা হয়ে আছে।

সন্ন্যাসী আদি গঙ্গার জল ছেটাচ্ছে চাতালে। রামসেবকের গায়ে কয়েক ফোঁটা পড়তেই ও উঠে বসল। চোখ দুটো কচলে নিয়ে বললে, প্রণাম নাও গুরু।

শালা এত টাকা রোজগার করিস, একটা ঘর ভাড়া নিতে পারিসনে।

জবার টিকলিটা আগে গড়াই।

ওখানেই তো থাকতে পারিস।

বিয়ে না করলে ওর বাবা থাকতে দেবে না।

তোকে বিয়ে করবে জবা! হাসালি তুই। বেটা ডোমকে কখনও বিয়ে করে ধোপানী!

কেন করবে না? আমার মাসে দু-হাজার টাকা রোজগার।

ওর চোলাই বিক্রি করেও কম হয় না। যা, মুখ-চোখ ধুয়ে দু-কাপ চা নিয়ে আয়। কাল রাতে মশার জ্বালায় ভাল ঘুম হয়নি। তুই তো ভালই ঘুমলি।

চারটের সময় শুয়েছি। এক রত্তি ছেলে—শালা লাশ পুড়তে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। আজকালকার ছেলে, শক্ত হাড়।

এ-জন্যেই তোকে ভাল লাগে না। সকালে উঠেই মড়ার গল্প। এর চেয়ে জবার কথা বল, চুন্নুর কথা বল, শুনতে রাজী আছি। ওসব ভাল লাগে না।

কেন গুরু!

সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেললো। থমকে দাঁড়িয়ে মৌন হয়ে রইল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকটা। তারপর শুরু করল, আমাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায়। বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র, সচ্ছল সংসার। ভগবান সুখ দিয়েছিল—দু-হাত ভ'রে। কিন্তু সইল

না। একদিন রাতে ডাকাত পড়ল। আমি গিয়েছিলাম যাত্রা শুনতে। ছেলেটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। পেটোর আঘাতে ছেলের দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওর মা ছুটে এসেছিল ছেলেটাকে বাঁচাতে। সেও মরল পাইপগানের গুলিতে। গ্রামের লোক ডাকাতদের তাড়া করেছিল, কিছুই নিতে পারেনি ওরা; কিন্তু আমার সবই নিয়ে গেল। বৌ-ছেলে। গ্রামে ডাকাত পড়েছে শুনে ছুটে এলুম ঘরে; গ্রামের লোক জড় হয়েছিল। সব শেষ। পুলিস এলো। চেরাই হাউসে লাশ নিয়ে গেল। সঙ্গে এলুম আমি। তারপর শ্মশানে। আদি গঙ্গার বুকে পুতে দিলুম বৌ-ছেলের নাভি। চান করলুম আদি গঙ্গার পচা জলে। আর ফিরে যাইনি,—এখানেই রইলুম পড়ে। জয়গুরুর আশ্রমে। গুরুদেব এখানের ভার দিয়ে তীর্থে চলে গেল। আর ফিরল না। যখের ধনের মত আগলে রইলুম এই মঠ। শিষ্যেরা আসে, গান গায়, শান্তি খুঁজে বেড়ায় এখানে আদি গঙ্গার ঘাটে। আমার ভেতরটা জ্বলে। হায়! আমি ওদের শান্তি দেব কোথা থেকে। অন্ধ অন্ধের কাছে পথ দেখতে চায়।—যা চা নিয়ে আয়। অনেকটা বেলা হল।

রামসেবক কেটলি নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। সকালের কোলকাতা। রাস্তার কলে ভীড়। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ খালি বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

রামসেবককে এ পাড়ার সবাই চেনে। ওকে পথ ছেড়ে দেয়। মুখ চোখ ধুয়ে নিয়ে রাম কমলের দোকানে লাইন দেয়। দু-কাপ চা কেটলিতে ভ'রে নিয়ে ও ফিরে আসে মঠের চাতালে। এর মধ্যে সন্ন্যাসীর চান সারা হয়ে গেছে। গুরুকে প্রণাম করছে এক মনে। মনে মনে বলছে,—মুক্তি দাও ঠাকুর। এবার মুক্তি দাও।

রামসেবক বাইরে গরম চা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সূর্যটা এবার আকাশের মধ্যিখানে এগিয়ে আসছে।

শ্মশানে মড়া এসেছে। ওখানে ডিউটি দিচ্ছে রামের পার্টনার মধু। রামসেবকের মনটা চলে গেল ওখানে। জবাকে টিকলিটা

গড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ও স্বস্তি পাচ্ছে না : বড় ভাল মেয়ে। যৌবন উছলে পড়ছে। নিটোল গড়ন। চক্ চকে মসৃণ দেহ। মেয়েদের দেখলেই রামসেবকের বিস্ময় জাগে। ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি এই মেয়ে মানুষ। জবার সামান্য আঙুলের ছোঁয়াও ওর মনে দোলা লাগিয়ে দেয়। ওর হাতের কাঁচের চুড়ির শব্দ রামের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। কাল জোর করে ও জবার কাছ থেকে দু-গ্লাস বেশী চোলাই খেয়েছে। প্রথমে ও কিছুতেই রাজী হয়নি। আশ্চর্য! ছ-আনা গ্লাস, বার আনা-পয়সা পাবে, তাও ও দিতে রাজী নয়। বলে, এ সব না খাওয়াই ভাল। মধুকে কিন্তু এ-সব কথা বলে না। মধু চার গ্লাস চাইলেও ও হাত বাড়িয়ে কলসী থেকে গ্লাস ভর্ত্তি করে চুমুক দেয়।

সন্ন্যাসী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কি-রে কি ভাবছিস? নে চা ঢাল, এতক্ষণে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

রামসেবক সন্ন্যাসীর এলুমিনিয়ামের গ্লাসে চা ঢেলে দেয়। সন্ন্যাসী গ্লাসটা মুখে ঠেকিয়ে বলে, চা টা সত্যিই ভাল। আর একটু দে।

রামসেবক সন্ন্যাসীর গ্লাসে আরও খানিকটা ঢেলে দিয়ে নিজের ভাঁড়টায় চা ঢালে।

সন্ন্যাসী বলে, যা চান করে বাজার থেকে যা হয় কিছু নিয়ে আয়। আজ খিচুড়ী চড়াব।

গুরু তোমার রান্না খিচুড়ী কিন্তু ভোলার নয়। সঙ্গে ফুলকপি দিতে ভুল না হয় যেন।

রামসেবক চাতালের এক কোণে টাঙ্গান গামছাটা নিয়ে চান করতে চলে গেল। রাস্তার সরকারী কলটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। রামসেবক রাজ্যের ছাই ভস্ম গা থেকে ঘসে ঘসে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করল না।

ওদিকে সন্ন্যাসী উনুনে ঘুঁটে সাজিয়ে কয়লা দিল যত্ন করে।

গঙ্গার জল বাড়ছে একটু একটু করে। ফুলে যাওয়া কুকুরের দেহটা ভেসে ভেসে চলল জলের টানে।

এক ফালি মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে। এখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এখানের মিষ্টি হাওয়ায়।

সন্ন্যাসী কাগজ জ্বেলে আঁচ ধরাচ্ছে।

তিন

জবা চোলাই-এর কলসী নিয়ে বসেছে। বম্বেপ্রিণ্টের 'রাইকমল' শাড়ীখানা পরলে ওকে সত্যিই মানায়। চেষ্টা করেও ও যৌবনের দম্ভকে আড়াল করতে পারে না। মধুকে আরও এক গ্লাস চোলাই দিল জবা। মনে মনে হিসেব করে নিল,— তিন গ্লাস।

মধু জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, জবা তোর চুল্লুতে নেশাটা জমে ভাল।

জবা মধুর কথায় বিশেষ কিছু আমল দিল না। ও রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। রামসেবক আজ বড় দেরী করছে। অন্যদিন এতক্ষণে এসে পড়ে। আবার কোনও ঝামেলা বাধাল কি-না কে জানে। ঝামেলা তো লেগেই আছে। গত সপ্তাহে একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। থানা পুলিস কত কি হল। কোর্টে একশ টাকা জরিমানা দিয়ে এসেছে।

মধু খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আর এক গ্লাস দে। আজ আবার রাত ডিউটি। পেটে মাল না পড়লে রাত জাগতে পারব না। শালা আজকালকার ছোড়াগুলো বড় কিপ্‌টে। পয়সা ছাড়তে চায় না। বুড়োগুলো বরং ভাল। ভালয় ভালয় পয়সা মিটিয়ে দেয়।

রাম এসেছে: গোটা পাঁচেক খদ্দের সঙ্গে নিয়ে এসেছে।—জবার চুল্লু খেয়ে নিন, শরীর ঠিক হয়ে যাবে, গায়ের ব্যথা মরে যাবে এখুনি। জবা, বাবুদের দু-গ্লাস করে দে।

জবা ঠোঁট চেপে হাসল; চুল্লুর গ্লাস ভর্ত্তি করল। আগন্তুকরা নিমেষের মধ্যে নির্ভেজাল চুল্লু গলায় ঢেলে দিল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ওরা নীরবে বিদায় নিল।

রামসেবক মধুকে উদ্দেশ করে বললে, এই শালা, তুই এখনও এখানে মাল খাচ্ছিস, ওদিকে যে মড়ার লাইন পড়ে গেছে।

মধুর সম্বিত ফিরে এলো। ও ভূত দেখার মত রামসেবককে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চলতে শুরু করল।

জবা বললে, দামটা দিয়ে যাও।

মধু জবাব দিলে, ধার রইল, কাল পাবি। মধু চলে গেল।

রাম জবার গা ঘেঁসে বসেছে। জবা এক গ্লাস রামের হাতে তুলে দিয়ে বললে, একটু সরে বস, এখনই হয়ত বাবা এসে পড়বে। পুরুষ মানুষের গা ঘেঁসে বসলে বুড়ো চটে যাবে, আস্ত রাখবে না।

রাম বলে, জবা তোর টিকলি গড়তে দিয়েছি। পরশু পাবো; শালা সোনার দাম যা বেড়েছে। এক রত্তি সোনা—ফুঁ দিলে উড়ে যায়—শালা স্যাকরা বলে কি-না দু-হাজার টাকা।

অত টাকা দিয়ে টিকলি গড়তে গেলে কেন? জবা রামসেবককে মন থেকেই কথাগুলো বলে যায়। ওর বলার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই।

আমার টাকা কি-হবে বল, তিন কুলে কেউ নেই।

কেন তোমার মা? তুমি যে এক দিন বললে।—

ওসব ছাড়, কবে কি নেশার ঝোঁকে বকে মরেছি, তা নিয়ে আর ভাবিসনে। তোর মাথায় টিকলি পরিয়ে দিয়ে তোকে শুধু দু-চোখ ভ'রে দেখব।

থাক খুব হয়েছে। জবা একটু সরে বসে।

দে আর এক গ্লাস। রামসেবক খালি গ্লাসটা জবার দিকে এগিয়ে দেয়।

জবা পাশের বালতি থেকে জল নিয়ে গ্লাসটা আবার ধুয়ে নেয়, এক টুকরো কাচা কাপড় কলসীর মুখে বেঁধে গ্লাসে চোলাই ঢালে। বলে দু-গ্লাসের বেশী হবে না কিন্তু।

আগে দু-গ্লাস হোক তো।

রাম এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেলে। আবার হাত বাড়ায়।

জবা ঘাড় নেড়ে বলে, না।

রামসেবক বলে, গত জন্মে তুই আমার রাণী ছিলি জবা। সখীরা নাচত, তুই পেয়ালা ভর্ত্তি করে সরাব দিতিস।

তোমার নেশা ধরেছে দেখছি।

নেশা নয় রে! দু-গ্লাসে আমার নেশা হয় না। সত্যি কথাই বলছি।

রামসেবক দাঁড়িয়ে জবার দিকে এগিয়ে যায়।

জবা পাশের ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

জবা অনেকক্ষণ দরজা খুললো না।

রামসেবক কয়েকবার ডাকলে, জবা।

জবা ওপার থেকে বললে, বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।

রামসেবক চলে গেল।

জবা দরজাটা একটু ফাঁক করে এ ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর দরজা খুলে বাইরে আসে। চোলাই-এর কলসীটা ভেতর ঘরে নিয়ে গিয়ে বার দোরে খিল এঁটে দেয়। ওর বাবা আসেনি তখনও। রামসেবককে ফিরিয়ে দিতে ওর মন চায় না। তবুও কেন যে ফিরিয়ে দেয়, ও নিজেও বুঝতে পারে না। বেচারা অনেক আশা নিয়ে আসে, ভালবাসে, আর জবা শূন্য হাতে বিদেয় দেয়। রাত বেশী হয় নি। গলিটা গন্‌জাম। হৈ-হল্লা চলেছে এখানে। জবার শূন্য ঘরে ও একা। বাপ নেই। গেছে রাসবিহারীর মোড়ে দোকান দিতে। নটা বাজে, চোলাই বিক্রি বন্ধ। ও একা-একা বন্ধ ঘরের অন্ধকারে রামসেবককে ভাবে। সেই কবে আদ্দিকালে ও আসত বাবার কাছে, কাপড় ধোলাই করাতে। জবা কত ছোট; ফ্রক পরা মেয়ে, আদুরে, বাপের সঙ্গে কাপড়ের খোঁট ধরে কাপড় ইস্ত্রিকরার কাজে বাবাকে সাহায্য করত। রামসেবকের তখন ভরা যৌবন। গায়ের রংটা তেমন ফরসা ছিল না ঠিকই; তবুও চোখে লাগার মত চেহারা ছিল ওর; রামচন্দ্রও গোরা ছিল না। কথক-ঠাকুর রূপ বর্ণনা করত এপাড়ায়—রামকথা শুনতো জবা মন দিয়ে,

আর রামসেবককে ভাবত মনে মনে। হায় রে কোথায় গেল সেদিনের দিনগুলো। কোথায় গেল কথক-ঠাকুর; কোথায় গেল কাপড়ের খোঁট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাবার মুখোমুখি। দেশটা পাল্টে গেল; ধোপার কাজ গেল বন্ধ হয়ে।

ওর বাবা ডাকছে, কই রে জবা।

জবা দরজা খুলে দেয়।

চার

এই কমলী উঠে পড়, গা ধুয়ে নে। এখুনি আবার জল চলে যাবে।

কমলী ঘুমুচ্ছে।

মাগীর ঘুম ভাঙবে না। কাল সারারাত ওর ঘরে নাগর ছিল। —পাশের ঘর থেকে রেখা জবাব দিলে।

জল চলে গেলে বেচারী সারাদিন চান করতে পারবে না। জ্যোৎস্না কমলীকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলে।

পাশে পড়ে থাকা শাড়ীটাকে টেনে নিয়ে কমলী কলঘরে চলে গেল।

কলের জল বেশ সরু হয়ে গেছে। ওখানে ভীড় শুরু হয়ে গেছে।

টগর বললে, এই মহারাণী এসেছেন, মাগীর কপাল ভাল, কাল সারারাত ঘরে আলো জ্বলেছে।

কমলী জবাব দিলে, কেন, হিংসে হচ্ছিল বুঝি? তা তুইও একটাকে ঢুকিয়ে নিলি না কেন?

জ্যোৎস্না পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় মিলছিল, বললে, আহা! যা রূপ কে ঢুকবে ওর ঘরে।

টগর অপমানিত বোধ করল, বুড়ী খানকির কথা দেখ।

জ্যোৎস্না জবাব দিলে, তুইও তো একদিন বুড়ী হবি। এখনই তোর কাছে কেউ ঘেঁসতে চায় না, বুড়ী হ'লে তোর পানের দোকানেও কেউ পান কিনতেও আসবে না।

জবার বাবা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল, চিৎকার করে উঠল, জবা বেশ্যাগুলোকে চুপ করতে বল, কাল সারারাত একটুও ঘুমুতে পারিনি।

জবা চিৎকার করে বললে, তোমরা একটু চুপ কর। বাবা ঘুমুচ্ছে।

কমলী জবাব দিলে, তোর বাপকে বল, বেশ্যামাগী না হলে তো একটা রাতও কাটে না। মেয়েকে নাইনে না নামিয়ে মিনসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, কাঁচা পয়সাও আসছে, মেয়ের ঠসকও বাড়ছে। সতী সেজে বসেও আছে। আমার বাপ-মা যদি দেশের বাড়ীতে চুল্লু তৈরী করত; আমাকে কি-আর এ বয়সে রাস্তায় হা-পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

পাঁচ

চক্‌চকে আকাশে নক্ষত্রের চলাফেরা। নীলাভ আকাশ। গঙ্গা-ফড়িং ঘুমিয়ে আছে আদি গঙ্গার ঘাটে; এরই এক কোণে বসে রামসেবক ভাবছে, জবা যদি এখানে থাকতো মন্দ হত না। রাতটা কাটত ভাল। শালা একটাও মড়া নেই; কাল দু-হাজার টাকা সেকরাকে দিতে হবে। একশ টাকার মত কম হচ্ছে; ও বেটা তো একপয়সাও ছাড়বে না। শকুনের মত চেহারা বেটার। কি-যে হিসেব করে তার ঠিক নেই। সেল-ট্যাক্স দিতে হবে বলে রসিদও দেবে না। শকুনিটা দম্ভ করে বলে, জোচ্চরি কারবার করে না। আরে বাবা জোচ্চরি কারবার না করলে এই বাজারে চারতলা বাড়ী হয় কোথা থেকে। ছেলে পুলিস-কোর্টে প্রাকটিশ করে, বলবে ছেলে করেছে। যাক্‌গে, পরের কথা ভেবে লাভ নেই। মধুটা ভাগ্যবান —কাল মড়ার লাইন পড়ে গিয়েছিল, আজ শালা একটাও নেই। শ্মশান ফাঁকা। চুল্লুর পয়সাও জুটবে না। সাধুর কাছে উনিশ-শ টাকা গচ্ছিত আছে। ও বেটা আবার পালিয়ে না গেলেই হল। না এ-দুনিয়ায় সবাই সমান নয়। এর আগেও তো ন-শ টাকা রেখে-

ছিল ও, সাধু পালায় নি। আর শালা পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? ও শালারও তিনকুলে কেউ নেই। বৌ-ছেলে মরেছে ডাকাতের গুলিতে —পেটোতে। একবার মঠে গেলে হত; সাধুটা কি করছে একটু দেখা দরকার। জবাই বা কি করেছে কে জানে। নটা বেজে গেছে অনেক আগে। এত রাতে কি-আর জবার ঘরের দরজা খোলা পাবে রাম। আরও এক গ্লাস পেলে মন্দ হত না। আজ নেশাটা তেমন জমেনি। জবাও কি ভেজাল দিচ্ছে। এ-দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না রামসেবক। চোখ দুটো বুজে আসছে। গঙ্গার ধারে বসে থাকলেই এটা হয়। শির শির হাওয়া দেয় এখানে; সাহেবরা এ-জন্যেই বড় গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী বানিয়েছিল—একটু হাওয়ার জন্যে। তখন তো ইলেকট্রিক ছিল না, টানা-পাখা চলতো। এসব ও শুনেছে; দেখেওছে। একবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে একটা সরকারী দপ্তরে টানা-পাখা দেখতে গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও বিস্ময় জাগে। বন্ধুরা সব গেল কোথায়! সবাই যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত; কেউ আর মনে রাখেনি রামকে। ডোমকে কেই বা মনে রাখে। জবা ওর কথা ভাবছে কি-না কে জানে; ডোম বলে জবাও হয়ত ঘৃণা করে।

সাত পাঁচ নানান কথা ভাবতে ভাবতে রামসেবক ঘুমিয়ে পড়ে আদি গঙ্গার শান বাঁধান ঘাটে। রাত্রি জমাট বেঁধে আসে। শ্মশানে লোকজন নেই। ওপারে রাস্তার আলোয় চোখে পড়ে উরুক্রম মঠের লাল পতাকা—বাঁশের ডগায় ঝুলছে। এপারে উঁচু ল্যাম্প-পোস্টটার মাথায় নাইট ল্যাম্প জ্বলছে আপন মনে। হঠাৎ একটা বোমার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল: রামের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। উঠে বসে রামসেবক। বুকটা হালকা হয়ে গেছে। একদিন ওরও দেহটা জ্বলবে এই চিতাগুলোর একটায়। মধু নয়ত অন্য কেউ এসে পুড়িয়ে দেবে। রাম চলে যাবে স্বর্গে। স্বর্গে না ছাই। ভূত হয়ে বসে থাকবে দেশবন্ধুর মন্দিরটার চুড়োয়। বয়ে গেছে ভূত হতে। কিছুই হবে না ও। কত মড়াই তো আসছে সকালে

বিকেলে ; সবাই যদি ভূত হত, তা হলে ভূতের ঠেলায় মানুষের জায়গা হত না এখানে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মরছে এখানে, কত ভূত হত এতদিনে তা হ'লে ; নেশাটা জমেছে ভালই। না, জবা চুল্লুতে ভেজাল দেয় নি। মেয়েটা খাঁটি আছে। বেশ্যামাগীগুলোর মত নয়। জবাকে ও পেল না এখনও। কাছে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয়। ডোম বলে কি ছোঁয় না? চুল্লুর গ্লাস দেওয়ার সময় হাতে হাত ঠেকে যায় রোজই। জবা মুচকি হাসে। হাসিটা ওর বড় মিষ্টি। ঠিক যেন কালীপুজোর ফুলঝুরি। চেতলার দিকে আবার বোমার শব্দ হল। না ওটা বোমা নয়, পেটো। হাড় কাঁপান শব্দ। নিশ্চয়ই কেউ মল। আরও একটা নতুন লাশ আসবে চেরাই হাউস ঘুরে। এখনও একশ টাকা বাকী। দু'হাজারের কম টিকলিটা দেবে না বেটা শকুনি। সাধুটা সটকালো কি-না একবার দেখা দরকার। উনিশ শ' টাকা! বেটা কেটে পড়লেই হল। সাধুকে বিশ্বাস নেই। বলবে,—'ঠাকুর আদেশ করল, তাই সট্‌কালুম।' বলার কিছুই নেই। ডোমের কথা কেই-বা বিশ্বাস করছে।

রামসেবক খাড়া হয়ে ওঠে। নতুন দেশবন্ধু পুলটা পেরিয়ে ওপারে যায়। উরুক্রম মঠটা অন্ধকারে ডুবে আছে। অমাবস্যা। চাঁদ নেই আকাশে। রাস্তার আলোটা রাস্তার ধারের দোকান-গুলোর জন্যে গঙ্গার পাড় পর্যন্ত আসতে পারে না। বেড়ালের মত চোখ বড় বড় করে গলি পেরিয়ে মাঠের চাতালে আসে রামসেবক। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। না! শালা কাটেনি। ঘুমুচ্ছে! রামসেবক এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে রাস্তার নেমে আসে। নেড়ী কুত্তাটা রামসেবককে চেনে। একটুও চিৎকার করল না, লেজ নেড়ে শুধু সম্ভাষণ জানাল।

আবার গলি পেরিয়ে দেশবন্ধু পুলে উঠে আসে রামসেবক। একবার জবার কাছে গেলে মন্দ হত না। দু'-পা এগিয়ে যায় রামসেবক। না। পা আর চলছে না। ওখানে এত রাত্তিরে গেলে

বেশ্যামাগীগুলো খিস্তি মারবে। বলবে, 'শালার গরমে ঘুম আসছে না, তাই সতীর মন্দিরে চলল।' না দরকার নেই, আবার ফিরে আসে রামসেবক। আবার ঘাটে গিয়ে বসে। ডিউটিতে ফাঁকি দেয় না ও। রাত ডিউটি! শ্মশান কখনও ফাঁকা যায় না। মড়া ঠিকই আসবে। আর এক গ্লাস হলে মন্দ হত না। পুলের নীচের দোকানটা খোলা থাকে সারারাত। না ওখানে গিয়ে লাভ নেই। পকেট খালি। একটা বিড়ি ধরায় রাম। মৌজ করে টানে। স্মৃতি-চারণ করে। ছেলেবেলার কথা ভাবে। বল্টু এখন কি করছে কে জানে। ছেলেবেলায় ওর মা মারা গিয়েছিল; ও দুঃখ করে বলেছিল,—'রাম তুই ভাগ্যবান, আমার আপনজন বলতে আর কেউ রইল না রে। ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে কেউই আপনজন নয় রে। যার মা নেই, তার কেউ নেই: তোর মা আছে। আমার নেই।'

বল্টু লেখাপড়ায় ভাল ছিল, রাম ছিল মন্দ। স্কুলে যেতে চাইত না। মাষ্টাররা কি-যে পড়াত, কিছুই বুঝত না রাম। ও বোকার মত চেয়ে থাকত মাষ্টারের দিকে। মাষ্টাররাও ওকে বাদ দিয়েই রেখেছিল। কেউ কোনদিন পড়া জিগ্‌গেস করে সঠিক উত্তর পায়নি বলে—কেউ আর পড়া জিগ্‌গেস করত না রামকে।

বোল্ বোল্ হরি বোল, বোল্ বোল্ হরি বোল্।

মড়া আসছে।

রামসেবক আবার খাড়া হ'য়ে উঠেছে। আরও একশ টাকা চাই। শকুনিটা দু'-হাজারের কম মাল দেবে না।

জবা মিষ্টি হাসবে। ওর হাসিটা বড় ভাল।

দুই

ঘোলাটে আকাশ। আজও হয়ত সূর্য উঠেছে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দিরটার গা বেয়ে। সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে রামের। মঠের সাধু এখনও ঘুমুচ্ছে দরজায় খিল এঁটে।

রাম ডাকলে, শুরু উঠে পড়, সকাল হয়ে গেছে। সাত সকালেই ঘুম ভেঙেছে রামের। ভাবনা রয়েছে মনে। সাধু ভেতরে আছে তো! আজ আবার জবাকে টিকলি দেওয়ার দিন। চল্লিশ টাকা কম পড়েছে। সাধু ধার দেবে কি-না কে জানে। আবার দরজায় ধাক্কা দেয় রামসেবক।

ভেতর থেকে সাধু জবাব দিলে, খুলছি রে শালা।

সাধু দরজা খোলে, বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, কি-রে বেটা, কাল কি চুল্লু কম পড়েছে ?

রামসেবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যাক্ বেটা সাধু সট্‌কায়নি। না! সাধুরা সত্যিই সাধু। বেইমানী করে না। আজ জবাকে কথা দিয়েছে রাম।

যা চা নিয়ে আয়। আমি চানটা সেরে নি। কাল অনেক রাতে শুয়েছি। মশার জ্বালায় ঘুমুতে পারিনি।

কেন আমার তো ঘুম হয়েছে। রাম জবাব দিলে।

তোর যে শুয়োরের চামড়া। তোর গায়ে হুল ফোটায় কোন্ শালা।

রাম কেটলি নিয়ে চা আনতে গেল। একটা দিন কাটাতে পারলে সামনের হপ্তাহ থেকে দিনে ডিউটি পড়বে রামের। রাতে বেশ ঠাণ্ডা আছে। দিনে গরমের তাত বাড়ছে ; তারপর ভোর থেকেই মড়ার লাইন। আর আগুনের সঙ্গে সমানে লড়াই। আর ভাল লাগে না।

কেটলিতে চা ঢালতে ঢালতে কমল বললে, কি ভাবছিস রে ?

আর মড়া পুড়োতে ভাল লাগে না। ভাবছি, কোথাও চলে যাব।

কমল ঠাট্টা করে বলে, সে-কি রে ? ডোমের মড়াতে অরুচি। একেই বলে কলিকাল। বলি হ'লটা কি ! সত্যিকার সত্যযুগ শুরু হয়ে গেল।

রাম অপমানিত বোধ করলে ; না, এখানে আর চা আনতে আসবে না ও। কমল চা-টা আবার একটু উনুনে বসিয়ে গরম করে দিল।

রাম চা নিয়ে মঠে এসে দেখে প্রতি দিনের মত আজও সাধু ধ্যানে বসেছে ; অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকে ; খানিক পরে চোখ মেলে দেখে রাম চা নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। সাধু এবার গুরুকে প্রণাম করে চিৎকার করে বলে, এবার মুক্তি দাও ঠাকুর। আর যে পারি না। এবার মুক্তি দাও।

রামের মনের কথা সাধু বলছে ওর গুরুর কাছে। রামসেবক ভাবে, সকলেরই একই অবস্থা। সবাই ঠাকুরের কাছে মুক্তি চাইছে। কিন্তু মুক্তি কোথা ? রাম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুক্তি তো একমাত্র শ্মশানে। এখানেই মুক্তি, মুক্তি আর কোথাও নেই।

সাধু বললে, নে চা ঢাল।

রাম এলুমিনিয়ামের গ্লাসে চা ঢাললে।

সাধু দরজার বাইরে চাতালের এক কোণে বসে চায়ে মুখ দিয়ে বললে, তুই আছিস, তবুও একটা বন্ধু পেলাম। আমার যে আর কেউ নেইরে।

কেন গুরু, আমি ডোম, তোমার বন্ধু হব কেন ? তোমার কাছে কত মানুষ আসে, আমার কাছে কেউ আসে না। ডোম বলে ঘেন্না করে।

তা করুক। আমি করি না। তুই একমাত্র বন্ধু। মানুষের অসময়ে তুই পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করিস।

সে তো পয়সার বিনিময়ে।

যদি কেউ পয়সা না দিতে পারে ?

লাশ পুড়বে না। জবার টিকলি এখনও দেওয়া হয়নি।

সত্যি পুড়বে না ? বলিস কি-রে ! তোকে দেখে তো সে কথা মনে হয় না।

কেন পুড়বে না, তবে একটু দেরী হবে। যদি দেখি সত্যিই মাল নেই, তবে আলাদা কথা। এটুকু না করলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না গুরু।

নরকেই তো আছিস। এর চেয়ে বড় নরক আর কোথায় পাবি ?

নরক বলছ কেন গুরু? তুমি যে মুক্তি চাইছিলে, সেই মুক্তি তো এখানেই।—এই শ্মশানে। মড়া না পুড়লে যে পচে গন্ধ ছাড়বে।

হায়রে আমাদের পরিণতি!

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে! এই দেহটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমরা কতবার আয়নায় দেখি বল দেখি। এক এক সময়ে ভাবি, জবা তুইও মরবি। কত মেয়ে মানুষই তো মরে। লাশ একবেলা পেরিয়ে গেলেই পচন ধরে।

নে, চাটা খেয়ে নে।

হাঁ। রাম ভাঁড়ে চা ঢেলে মুখে ঠেকায়। যতক্ষণ আছি, খেতে তো হবেই। জান গুরু, জবা বলে, 'দু-গ্লাসের বেশী দেব না। তোমাকে বাঁচতে হবে।' আরে বাবা! একদিন মরতেই হবে। মরাকে অত ভয় করলে চলবে কেন? আচ্ছা গুরু চল্লিশ টাকা ধার দেবে?

তোর তো অনেক টাকা আমার কাছে পড়ে আছে। তার থেকে নে না।

ওর সঙ্গে আরও চল্লিশ টাকা যোগ করলে তবে টিকলিটা পাওয়া যাবে, আমি যে জবাকে কথা দিয়েছি; আজ ওকে টিকলি দেব।

বেশ, নিয়ে যাস। আমার আর টাকা কি হবে বল। যার তিন কুলে কেউ নেই, তার আর টাকার দরকার কি? জানিস রাম, সাধুরা ভালই আছে: শিষ্যের মাথায় পা দিলেই টাকা। তোর মত দিন রাত মড়া ঠেলতে হয় না।

তুমি ভালই আছ গুরু।

না-রে, ভাল নেই। এসব পোষায় না। পাপের পয়সা। আমি মুক্তি দেওয়ার কে? যা, এবার বাজার থেকে কিছু কিনে আন। আজ আবার চাল বাড়ন্ত।

রামসেবক বাজারের থলি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

সাধু উনুনে কয়লা দিল—ঘুঁটে সাজিয়ে।

সন্ধ্যে হয় হয়। গলিটার মোড়ে পরীদের মেলা। ওখানে ঢুকতে গা ছমছম্ করে। রামসেবক ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়। রামকে দেখে একজন টিপ্পনি কাটে, জবার নাগর যাচ্ছে।

আর একজন বললে, ডোমের সাজ দেখ, যেন যাত্রাদলের অধিকারী।

পেছন থেকে টগর জবাব দিলে, মাথাটা দেখ, টাকে তেল ঘসেছে কত; ঠিক যেন পালিস করা পিঁড়ে। আলো পড়ে বিজ্‌লী চম্‌কাচ্ছে।

রামসেবক এ সব তোয়াক্কা না করে হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়। গলিটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। এখানে কুমোরদের ঠাকুর গড়ার হিড়িক চলেছে। সামনেই বড় একটা পুজো। পাশেই জবাদের ঘর। জবা বসে আছে কলসীটাকে ঘরের কোণে রেখে,—খদ্দেরের আশায়। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কাঁচটা পরিষ্কার করে মোছা। জবার শাড়ীটায় ঝিলিক দিচ্ছে। ও আজ একখানা নতুন শাড়ী পরেছে; গতবার পুজোয় ওর বাবা ওকে শাড়ীটা কিনে দিয়েছিল। ঘরটা ফাঁকা, জবার খদ্দের জোটেনি এখনও। সন্ধ্যের অতিথি বলতে রামসেবকই প্রথম।

রামকে দেখে মুচকি হেসে বুকের কাপড়টা টান করে নিয়ে সরে দাঁড়ায় জবা।

রাম কথা খুঁজে পায় না, বলে,—তোর বাবা কোথা?

এ সময়ে তো বাবা কোন দিনই থাকে না। গেছে রাসবিহারীর মোড়ে। তুমি তো জান ওখানের ফুটপাথে বাবা একটা প্লাসটিকের খেলনার দোকান দিয়েছে। আসবে নটার পরে।

রাম বলে, জবা একটু কাছে আয়।

কেন?

এদিকে আয়, টিকলিটা পরিয়ে দিই।

আমার হাতে দাও, আমি পরে নিচ্ছি।

না, তা হয় না। রাম জবার দিকে এগিয়ে যায়।

জবা মাটির প্রতিমার মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাম এগিয়ে গিয়ে জবার মাথায় টিকলিটা পরিয়ে দেয়; তার পরেই ছুটে গিয়ে একবার বাইরেটা দেখে নেয়, কেউ আসছে কি-না। না!

রাম ফিরে আসে। রাম জবাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা চুমু এঁকে দেয় ওর সরু ঠোঁট দুটোয়; তারপর চিবুকে।

জবার সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে, অবশ হয়ে আসছে ওর পা-দুটো। জবা ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে দরজায় খিল এঁটে দিল। অনেকক্ষণ শুয়ে রইল ওর ছোট্ট বিছানায় বালিশটাকে বুকে চেপে। তারপর উঠে গিয়ে লম্পটা জ্বালাল। অন্ধকার এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল ওকে। অন্ধকারে ও নিজেকে চিনতে পারছিল না কিছুতেই। এবার ছোট আরসিটা র‍্যাক থেকে নামিয়ে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখল জবা। টিকলিটা ঝুলছে কপালের উপরে চূর্ণ অলক-গুচ্ছের ফাঁকে। আনন্দ আর বিষাদ এক সঙ্গে জবার মনটাকে দুলিয়ে দিতে লাগল। হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে অনেকখানি। জবা চোখ বন্ধ করল, মনে মনে বললে,—রাম; আবার জিব কাটল জবা। স্বামীর নাম ধরতে নেই যে।

দু-জন খদ্দের এসেছে, বেশ্যাদের কাছে যাওয়ার আগে একটু মৌজ করে নিতে চায়। মনটাকে রাঙিয়ে তুলতে ব্যস্ত ওরা।

রাম ডাকলে, জবা বাইরে আয়; খদ্দের এসে দাঁড়িয়ে আছে।

জবার স্বস্তি ফিরে এলো। বাবা নটার মধ্যে ফিরে আসবে; তারপর হিসেব চাইবে—চোলাই বেচার।

জবা টিকলিটাকে খুলে হাতে করে নেড়ে চেড়ে দেখছে।

রাম আবার ডাকলো, জবা দরজা খোল। খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে।

জবা টিকলিটা কাঠের বাক্সে যত্ন করে রেখে দরজা খুলে বার ঘরে এলো।

জবাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে এবার। সেই হাসি আর নেই। কলসীর পাশে একটা পিঁড়িতে বসে ও একগ্লাস ভর্ত্তি করে রাম

সেবককে দিলে, তারপর আগন্তুকদের চোলাই পরিবেশন করলে ঘৃণা ভরে।

দু-গ্লাস করে চোলাই খেয়ে ওরা পয়সা মিটিয়ে চলে গেল।

জবা বসে রইল মৌন হয়ে।

রামসেবক অবাক হয়ে জবাকে দেখছে। জবা মুখ নীচু করে রামকে ভাবছে ; এ-জীবন শেষ হবে কবে ? কবে ঘর বাঁধবে ও ! রামসেবক ডোমের কাজ করে। এ কাজটাকে ও মনে মনে ঘৃণা করে। রাম মানুষটা ভাল, মনটা ওর ধোয়া মোছা। এই সমাজের আর পাঁচটা পুরুষের মত নয়। ওর মনে একটা ব্যথা আছে ! কি ? জবা তা জানে না। রামসেবকও জানায়নি কখনও। আর জানাবার সময়ই বা কোথা ! দিন রাত মড়া পুড়িয়ে নিজেও আধপোড়া হয়ে আসে ; আগুনের হলকা লেগে অমন সুন্দর চুলগুলো ঝলসে ঝলসে শেষ হয়ে গেল। তামাটে রং হল কালো।

রাম বললে, টিকলি তোর পছন্দ হয়েছে জবা ?

জবার মুখটা আজ সন্ধ্যের পশ্চিম আকাশের মত লাল হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে ও টিকলির কথা ভুলে রামের কথা ভাবছিল। বললে, খুব পছন্দ হয়েছে ; কিন্তু পরব কবে ? বাবা দেখলেই রাগ করবে। এ-আর ভাল লাগে না।

আমায় বিয়ে করবি জবা ? রাম সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়।

জবা কোনও জবাব দেয় না।

রাম আবার জিগ্‌গেস করে, কি-রে জবাব দিলি না যে ?

তুমি ওই কাজটা ছেড়ে দাও।

কেন ?

সবাই ঘেন্না করে।

কাজকে ঘেন্না করার কি আছে ? অসময়ে মানুষের কাজে তো লাগি। আর জানা যায়, আমাদের সমাজটা কোন্ দিকে মোড় ঘুরছে। দুঃখ হয় যখন দেখি, ছোট ছোট ছেলেগুলো গুলি খেয়ে মরে, যখন দেখি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মাথা ফাটিয়ে মানুষ মরে।

তা তুমি কি করবে!

সত্যিই তো আমি কি করব। আমি একটা ডোম, মড়া পোড়াই; চোলাই খাই; মড়া পুড়িয়ে পয়সা চাই। ধর্ম বলে আমার কিছু নেই।

জবা চুপ করে থাকে। ওর চোখ দুটো ছলছল করে আসে।

জবা কথা দে, আমায় বিয়ে করবি।

তুমি ওকাজ ছেড়ে দাও।

তুই চোলাই বিক্রি ছেড়ে দিবি বল।

জবা কোনও জবাব দেয় না।

একটা বুড়ো এসেছে। জবাকে দেখছে লোলুপ দৃষ্টি মেলে।

আট

চোলাইটা আজ বেশী খাওয়া হয়ে গেছে; অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবা এক গ্লাস বেশী দিয়েছে। জবা মেয়েটা সত্যিই ভাল। ওর বাবার জন্যেই ওকে এ-কাজ করতে হচ্ছে। ওর বাপটাই খারাপ। খারাপই বা বলি কি করে? পেট তো মানে না। পেটের জন্যেই মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়। এই যে ডোমের কাজ, এটাই কি খুব ভাল! কেন ভাল নয়, মানুষকে অসময়ে সাহায্য করা। এ-জীবন, জবা, সবই মিথ্যে, সত্যি এই মরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া; এটাই সত্যি। একদিন জবাও পুড়বে—পুড়বে রামসেবকও। রাম এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে শ্মশানের কাছাকাছি এসে হাজির হল। শ্মশানে নতুন একটা মড়া এসেছে। নিয়ে এসেছে গোটা-ছয়েক মস্তান। একটা মেয়ের লাশ, যুবতী, আইবুড়ো; সঙ্গে বোধহয় ওর বাবা; লোকটা ভদ্রগোছের। এবার রামসেবক টলতে টলতে লাশপোড়ানের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শব বাহকের একজন বললে, এই তো এসে গেছে।

বুড়োটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ আর নতুন কি! রোজই তো

একই দৃশ্য। এ দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে রামের। না দেখলেই অস্বস্তি বোধ করে ও। মনে মনে ভাবে, লোকগুলো কি সব পাথর হয়ে গেল ; ছেলে, বৌ, মা-মেয়ে মরলেও লোকগুলো কাঁদতে ভুলে গেছে।

একজন এগিয়ে এসে রামের হাতে একশ টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, অনেকক্ষণ বসে আছি রে, নে কাঠ এনে চুলি সাজিয়ে দে। ইলেকট্রিক চুল্লি বন্ধ।

এতগুলো টাকা? রাম একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে, এত টাকা লাগবে না, ত্রিশ টাকা হলেই হবে।

মেয়ের বাবা লাশটার কাছে বসে কাঁদছে।

ওদের একজন বললে, যা পেয়েছিস, লিয়ে লে, কাজ কর।

ডাক্তার বাবু এসেছিল ?

হাঁ, ডাক্তার মাল পেয়ে গেছে।

রামের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল, রাম ডাক্তারকে চেনে। লোকটার কথা রাম বিশ্বাস করল না, ও মেয়ের বাপকে বললে, কাপড়টা একটু সরান, মুখটা একবার দেখেনি।

মেয়ের বাবা ঢাকা দেওয়া কাপড়টা একটু সরিয়ে দিলে।

রাম চমকে উঠল ; ওরে শালা, এতো গলায় দড়ির লাশ।

রাম হন্ হন্ করে অফিস ঘরে চলে গেল, ডাক্তার তখন চিত্রগুপ্তের খাতায় মেয়ের নাম, ঠিকানা, মেয়ের বাপের নাম লিখে রাখতে ব্যস্ত।

রাম ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, লাশ দেখেছেন ?

না! এই তো ডেথ্ সার্টিফিকেট্।

মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে!

তা তোর কি ?

চেরাই হাউসে লাশ যায়নি!

অত খবরে তোর দরকার কি ?

দরকার আছে বৈকি!

আয় আমার সঙ্গে! ডাক্তার লেখা বন্ধ রেখে রামকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ডাক্তার বললে, এই শুনুম. এর সঙ্গে কথা বলুন, আমার কিছু করার নেই।

মেয়ের বাবা উঠে এসে রামের হাতদুটো ধরে বললে, আমার যা সর্বনাশ হওয়ার হয়েছে। আমিই মেয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

রাম কিছুই বুঝতে পারলে না, বোকার মত ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়ের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলে চলল, খেতে দিতে পারিনি বাবা, বাপ হয়ে মেয়েকে খেতে দিতে পারিনি, বিয়ে দিতে পারিনি। আজ দু'বছর হল কারখানা লক্-আউট্। মেয়ে নিজেই চাকরি জোগাড় করে নিয়ে ছিল। বড় কোম্পানী। মালিক নিজেই মেয়েটাকে একটা চাকরি দিয়েছিল; পার্সোনাল-সেক্রেটারির। তারপর একদিন জোর করে বেইজ্জতি করল। মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ইজ্জৎ বাঁচাল বাবা।

রাম মস্তানকে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে বললে, চলুন কাঠের দাম দিয়ে দেবেন। আমি কাঠ এনে চুলি সাজিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার বললে, রাম তোর মজুরি নিবি না?

না! বেইমানীর পয়সা রামসেবক ছোঁয় না।

রাম লোকটার সঙ্গে কাঠ আনতে গেল।

ডাক্তার ফিরে এলো নিজের দপ্তরে।

রাত বাড়ে, অন্ধকার গাঢ় হয়।

নয়

রাত থেকে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। উরুক্রম মঠের চাতালে জল জমে গেছে। আদি গঙ্গার ওপারে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে মহাশ্মশান। এপারে রাম বসে আছে মঠের খোলা দরজার চৌকাঠের পাশে। সাধু চাদর মুড়ি দিয়ে ভোরের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। একটা ভূতুড়ে রাত। অদ্ভুত সব চিন্তা ভাবনা রামকে পেয়ে বসেছে।

মরে গেলে মানুষের দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আত্মার নাকি বিনাশ নেই। ওই আত্মাই আবার দেহ ধারণ করে। এই সব সাতপাঁচ শুনে আসছে ও ছেলেবেলা থেকে। ভূত কখনও চোখে দেখেনি রাম। আত্মাও না। আত্মাকে নাকি দেখা যায় না।

অনেকক্ষণ থেকে সাধু লক্ষ্য করছে রামকে। ও যেন কি সব বলছে বিড়বিড় করে। প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। দালানটা অন্ধকার। বৃষ্টির বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ছটা। প্রদীপটা হাওয়ার দাপটে মাঝে মাঝে নিভে নিভে আসছে—আবার জ্বলে উঠছে স্বাভাবিক ভাবে।

সাধু অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে রামের দিকে, রাম কি যেন ভাবছে, গভীর ভাবনায় মগ্ন ও। সাধু প্রশ্ন করলে, কি ভাবছিস রে অমুন করে? জবা ভাল আছে তো?

রাম সম্বিত ফিরে পায়; একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করে সাধুর কাছে; গুরু, এত মানুষ মরে, ওরা যায় কোথা? আত্মা আছে কি? শুনেছি আত্মা মরে না। মানুষ আবার জন্ম নেয়! এসব সত্যি? না আজগুবি গল্প?

সাধু জবাব দেয়, দেখ, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমি আর কতটুকুই বা জানি। তবে আমি গুরুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, গুরুর পড়াশুনা আছে, জ্ঞানও গভীর, তাঁর কাছে শুনে যেটুকু জেনেছি—সেটুকুই তোকে আমি বলতে পারি—তার বেশী নয়।

রাম শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

সাধু শুরু করে ওর গুরুর কাছে শোনা পরলোকতত্ত্ব।

গীতায় আছে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির মত সূক্ষ্ম দেহই আত্মা। এর মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা-শক্তি সবই আছে। আত্মা বায়ুতে শুষ্ক হয় না, আগুনে পোড়ে না, একে ছেদন করা যায় না, জলে ভেজে না।

শঙ্করাচার্য বলেছেন—

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং,
পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ,
কথমিহ্ মানব তব সন্তোষ ॥"

অর্থাৎ 'পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও গর্ভযন্ত্রণা ভোগ সংসারের একটা প্রধান দোষ ; হে মানব! এই সংসারের জন্যে তবে তোমার এত কেন সন্তোষ?' শুনেছি সকল আত্মাই পরমাত্মার অংশ।

সাধু বলে চলে, যেদিন ঝকঝকে আকাশে চাঁদের আলোর বান ডাকে, মুক্ত আকাশে নক্ষত্র চলাফেরা করে, সেদিন আমি দিগন্ত প্রসারী ওই মহাশূন্যের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি,—হায়রে, মৃত্যুর পর আমাকে এই মহাশূন্যে যেতে হবে। প্রথমে অন্ধকার, তারপর অন্ধকার ভেদ করে নতুন দিগন্ত চোখের সামনে মুক্ত হয়ে পড়বে। অপরূপ প্রভাতে ক্ষুদ্র দেহ আবার রূপ পরিবর্তন করবে। কোনও রূপ ধারণ না করেও একটা সুন্দর দেহের অস্তিত্ব অনুভব করা যাবে। শুনেছি, প্রেতলোকে গেলে দিব্যচোখে কোটি কোটি সংসারের দেখা মেলে। কত মারামারি-হানাহানি দূর থেকে দেখা যায়। দূরে থেকে এই পৃথিবীকে খেলা-ঘর বলে মনে হয়। আত্মা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অতিক্রম করে অনন্ত মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। মহাকাশকে দেখা যায় কাছ থেকে। দেখা যায় অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুরছে আপন আপন্ কক্ষপথে ; একবার ভাবতো, কোন্ শক্তিবলে এসব সম্ভব! মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞানকে সাধনার দ্বারা প্রসারিত করে মহাকাশকে জানার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে ; কিন্তু বিরাট অনন্ত সীমাহীন মহাকাশকে কি জানতে পেরেছে, না পারেনি। জানার চেষ্টা করে চলেছে। আমরা রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে জন্মেছি—জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের কিছু কম নেই। তবুও বলব জ্ঞানের পূর্ণতা আমাদের নেই। আমরা আজও বিশ্ব-ভূমণ্ডলের অনেক কিছুই জানি না ;

অনন্ত মহাকাশকে জানা তো দূরের কথা। কিন্তু আত্মা এই মহাকাশে পাড়ি দিয়ে অন্য এক জগতে ঘুরে বেড়ায় আপন গতিতে।

রামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, ও হঠাৎ চিৎকার করে উঠে : গুরু এবার থামবে ; তোমার ওই গুরুর বই পড়া বিদ্যা আর মুখস্থ বলতে হবে না। এতক্ষণ যা বকে গেলে আমি তার কিছুই বুঝলাম না। মড়া পোড়াই, আগুনের তাপে আমার ঘিলুতে আর কিছু নেই ; সব শুকিয়ে ছাই হয়ে গেছে। অত কঠিন শব্দ বোঝার মত মগজ আমার নেই। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ ; সকালের আলো ফুটে উঠেছে বারদালানে। তুমি বরং মুখে চোখে জল দিয়ে তোমার গুরু প্রণাম সেরে নাও। সেই ফাঁকে একটু গরম চা নিয়ে আসি।

সাধু অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল, বলা হল না, ও থেমে গিয়ে বলে, আমারি ভুল হয়েছে ; ডোমকে আমি পরলোকতত্ত্ব শোনাতে গিয়েছিলাম। ভুল হয়েছে। মাপ কর। আর কখনও বলব না। তুইও জানতে চাসনি ; যা, কেটলি নিয়ে একটু চা নিয়ে আয়।

রাম কেটলি নিয়ে জল ভেঙ্গে চা আনতে গলি পেরিয়ে রাজপথে নেমে আসে।

দশ

আদি গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। নর্দমার ময়লা জল ধুয়ে গেছে স্রোতের টানে। একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘাটের পলি আর কাদা ঢাকা পড়ে গেছে গেরুয়া নদীর জলে। ঝিম্ ধরা রাত গভীর হচ্ছে একটু একটু করে। দশটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকী। উরুক্রম মঠে 'হ্যাজাক্' জ্বলছে তখনও। গোটা পাঁচেক বিধবা এসেছে চেতলা থেকে, জয়গুরুর ভজনা গাইছে এক সঙ্গে। সাধু বসে আছে ওদের সামনে। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গানের সুরটা রামের কানে এসে বাজছে। মন্দ লাগছে না। একটু আগেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। হাওয়া

বইছে আলতো করে। এখন শ্মশানে মড়া নেই একটাও। রাম বসে আছে ঘাটের এক কোণে। জবার কথা ভাবছে ও। জবা বলেছে—একাজটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত মজার কাজ কি আর পাওয়া যাবে। কাজ না থাকে ঘুমোও। কাজ থাকলেই উপরি পাওনা। কামিয়ে নাও যত খুশী। কেউ বাধা দেবে না। রামসেবক ভাবে—না উপরি পয়সা আর ও নেবে না। লোকের অসময়ে ওদের কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করা। এত পাপ কি সইবে! আর কিসের জন্যেইবা পয়সা নেওয়া? জবার টিকলি তো ওকে দেওয়া হয়ে গেছে। মনের সাধ মিটে গেছে। দু-একটা শাড়ী, সে তো মাসকাবারি মাইনে থেকেই দেওয়া যায়। শুধু শুধু মনটাকে ছোট করে লাভ কি? একদিন সবই ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই পৃথিবী, এই মাটি, এই আলো—জবা—সবই পড়ে থাকবে। হায়! সব জেনেও মানুষ বুঝতে চায় না কিছুই। এখানে মানুষ মানুষকে মারে; দেশের কাজ করব বলে নেতারা ভোট ভিক্ষে করে—তারপর সবই ভুলে যায়। শুধু ভোগ—আর আনন্দের জন্যে সমস্ত অবিচার আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। কারখানার মালিক নিষ্পাপ একটা মেয়ের উপর অত্যাচার করে, মেয়েটা লজ্জায় আত্মহত্যা করে। শুধু কিছু টাকার লোভে কিছু যুবক লাশ নিয়ে আসে। যার যাওয়ার তারই যায়। ওই সব পয়সাওয়ালা লোকগুলো সং সেজে সমাজের মাথার উপর বসে থাকে। ভদ্রলোকের মেয়েরা আবার তারই দরজায় চাকরির জন্যে ধর্ণা দেয়।

রামের মনটা খিঁচড়ে আছে। পৃথিবীটা ক্লান্ত। অন্ধকার আকাশে গৃধিনীর চিৎকার শুরু হয়। এই পৃথিবীর রাত ফুরোয়। সকাল হয়। সবুজ ঘাসে সূর্যের আলো পড়ে। ঝিলমিলে রোদে আবার প্রাণের ছোঁয়া লাগে। আবার একটু একটু করে রাত্রি গভীর হয়ে আসে।

ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে মনটা। জবা এখন কি করছে কে জানে! নটার পরেই ওর বাপ ফিরে আসে। তারপরেই দরজা বন্ধ।

আশ্চর্য ! জবা কি করে যে থাকে ওখানে। না থেকেই বা উপায় কি ! কোলকাতায় এখন একটা ঘর দু'শ টাকার কম পাওয়া যায় না। আর অন্য কোথাও বসে চোলাই বিক্রিও চলবে না। পুলিস এসে হামলা করবে। খেয়ে পয়সা দেবে না পাড়ার মস্তানরা। রাজনীতি করা মস্তানরা। কোথায়ই বা যাবে জবা। ওকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র রামসেবকই। সত্যিকথা বলতে কি জবার বাপটাই খচ্চোর। ধোপার কাজ করত, কাপড় কাচত, ইস্ত্রি করত ; চলেও যেত। কিন্তু খেটে খেতে চায় না ও। কিছু বললেই বলে: —শালা কাপড়-কাচাব জল কোথায় ? চানের জল, খাওয়ার জলই পাই না তো কাপড় কাচার। তা ছাড়া বেশ্যামাগীদের কাপড় কাচতে আর ইচ্ছে করে না। ওসব ভদ্রলোকের কাজ নয়। রামসেবক হাসে, চুল্লু বিক্রি ভদ্রলোকের কাজ। যাক্‌গে ওসব কথা. পরের কথা ভেবে কি হবে, নিজের কথাই ধরা যাক না। ওকে ডোম বলে সবাই ঘেন্না করে, কিন্তু বিপদে পড়লে এই ডোমকেই দরকার পড়ে। চুলি সাজিয়ে না দিলে মড়া পোড়ে না। হায়রে দুনিয়া !

—তুমি এখানে ? আমি সারা কালীঘাট চক্কর দিয়েও তোমায় দেখতে না পেয়ে ডাক্তারবাবুকে জিগ্‌গেস করলুম। ডাক্তার বললে, গঙ্গার ঘাটে গাঁজা খেয়ে পড়ে আছে দেখ। তুমি গাঁজাও খাও ! জবা দুঃখ করে কথাগুলো বলে গেল।

জবা ? তুই এত রাতে ! তোর কথাই ভাবছিলাম। না রে, গাঁজা আমি খাই না। ডাক্তারবাবু জানে না। যা খুশী বলেছে। তোর বাবা বাড়ী নেই ?

না। বাবা জয়নগর গেছে মালের দাম দিতে। সকালে ফিরবে।

রামসেবক ওকে পাশের চাতালটায় বসতে বলে। অন্ধকার পক্ষ, আকাশে চাঁদ নেই। বর্ষার পদধ্বনি তখনও শোনা যায়নি, তবুও মাঝে আরও দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভরা গঙ্গার জল চাতালটার কাছ পর্যন্ত উঠে এসেছে। উরুক্রম মঠের পতাকা ঝুলছে ওপারে বাঁশের ডগায়। নীচে কচি নেবুপাতার মত সবুজ ঘাস। ওপারে

নির্জনতা, আর এপারে নিস্তব্ধ শ্মশানে দুটি প্রাণের ছোঁয়া। শ্মশানের চৌহদ্দীর পাশে কালো অন্ধকারে জোনাকীদের দল বেঁধে উড়ে যাওয়া ; রাম বললে, জবা চল, কোথাও চলে যাই। এখানে আর ভাল লাগে না।

কোথায় যাবে ?

দুর্গাপুরে আমার এক আত্মীয় আছে। সরকারের বিজ্‌লী-কারখানায় চাকরি করে। ভাবছি, ওর কাছেই গিয়ে হাজির হব।

আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু পরের ভিটেতে পরের অন্ন, না কিছুতেই নয়। অন্য কোথাও যদি যেতে চাও, রাজী আছি।

পেটের কিছু ব্যবস্থা না করে কোথাও যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? এখানে তবুও পেটের চিন্তা করতে হয় না। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কোথায় যাই বলতো !

রামসেবক চিন্তা করতে শুরু করল। ভাবনার অতলে ডুব দিয়েও কোনও কিনারা খুঁজে পেল না ও।

জবা বললে, এবার চলি ; ওদিকে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি ; জায়গাটাতো ভাল নয়। হয়ত গিয়ে দেখব, দরজা ভেঙ্গে সব চুরি হয়ে গেছে। সন্ধ্যে থেকে বিক্রি বন্ধ। ও পাড়ার মেয়েমানুষের কাছে আজকাল বিশেষ আর কেউ আসে না। অথচ দিন দিন মেয়েমানুষ বাড়ছে ও পাড়ায়। গাঁ-গঞ্জ থেকে দলে দলে মেয়েরা চলে আসছে ; শুধু পেটের জ্বালায়। বৃথাই এখানে এসে ভীড় বাড়াচ্ছে। অবাধ মেলামেশা শুরু হয়ে গেছে। আগেকার দিন আর নেই ; ভদ্রঘরের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করছে, তাতে করে রিকসাওয়ালা আর ভুজাওয়ালা ছাড়া আর কেউ এ-পাড়ায় বড় একটা আসছে না। তবে কিছু কিছু বুড়ো পুরান অভ্যাস ছাড়তে পারে নি, ওরাই এখানের বুড়ীদের কাছে ঘুরে গিয়ে কিছু পয়সা দিয়ে যায়।

এদের ছেলেমেয়েরা কখনও ভাল হতে পারে ?

জবা প্রতিবাদ জানায় ; বলে, কেন পারে না ? একটা ঘটনা বলি

শোন। আমার ওখানে একটা বুড়ো চোলাই খেতে আসে ; বুড়োর ছেলেটা একটা বিদেশী কোম্পানীতে বড় চাকরি করে। ও বাপকে অনেক বুঝিয়েও পারেনি। শেষে ছেলে বাপের জন্যে বিলিতি মদ কিনে দিয়েছে। কিন্তু চোলাই ছাড়া বাপের চলে না। নেশা এমনি। লোকটা আর কতদিন বাঁচবে জানি না। ভাল করে চলতে পারে না। চোখেও ভাল দেখে না। ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে : সকলে যখন চলে যায়, ভীড়টা পাতলা হয়ে আসে, ছেলে তখন রিক্সায় করে বাপকে নিয়ে আসে। ছেলের কড়া হুকুম, এক গ্লাসের বেশী যেন না দেই। এক গ্লাস চোলাই খেয়ে বুড়ো একটু বসে, সুখ-দুঃখের গল্প করে ; তারপর বুড়োকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিই ; বুড়ো আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রিক্সার কাছে : ওখানে ছেলে বুড়ো বাপকে ধরে রিক্সায় বসিয়ে দেয়। তারপর দু-জনে বাড়ী ফিরে যায় ; ভদ্রলোক থাকে মহিম হালদার ষ্ট্রীটে। চলি, লোকটা আজ এলো না কেন কি জানি ! হয়ত শরীর খারাপ, নয়তো ছেলে বাড়ী ফেরেনি। আমার এখানে আসাটা হয়ত ঠিক হয়নি। যদি দরজা বন্ধ দেখে বুড়ো ফিরে যায়।

রাম বললে, আর একটু বস্ জবা। এমন করে তোকে কোন দিন পাইনি।

রাম জবাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। আজকের আদি গঙ্গার মতই জবার ভরা যৌবন। রামের হৃদ্‌পিণ্ডের দপ্‌দপানি শুরু হয়ে যায়। রক্ত টগ্‌বগিয়ে উঠে। রাম জোর করে চিবুকটা ধরে ওর নরম ঠোঁটে চুমু এঁকে চলে একটার পর একটা।

'বল হরি-হরি বোল।' রাম বলে উঠে, আর সময় পেল না। জবা বাসায় যা। ভদ্রলোকের মড়া এসেছে।

জবার সারা শরীর অসাড় হয়ে আসে। জবা জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। ও প্রথমে কথা বলতে পারে না : পরে একটু সামলে নিয়ে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, কি করে বুঝলে ভদ্রলোকের মড়া ?

ভদ্রলোকের গলা শুনলেই বুঝতে পারি। ওরা চেংড়াগুলোর মত

'যুগ যুগ জিও' ধরনের 'বোল্ হরি-হরি বোল্' বলে না। চিৎকার করে না কখনও। নীচু গলায় হরি-ঠাকুরের নাম করে। কেউ যদি হরিনাম খোল-খত্তাল নিয়ে আসে, আমি মঠে বসে বলে দেব, বুড়ী মড়া এসেছে!

জবা উঠে দাঁড়িয়েছে।

রাম আবার নতুন করে শেষ বারের মত জবাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। ওকে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না রামের। চিরদিনের মত জবাকে বুকের মধ্যে আড়াল করে রাখতে চায় ও।

জবা এবার চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

জবাকে যেতে দিতে হয়; হয়ত বুড়োটা আসবে চোলাই খেতে, ছেলে নিয়ে আসবে বাপকে রিক্সায় করে। হায়রে ভালবাসা!

জবা চলে যায়।

ভরা জোয়ারে আদিগঙ্গার ছোট ছোট ঢেউএর মত ছন্দে দুলে জবা চলে যায়।

জবাকে ছেড়ে দিতে মন চায় না রামের। তবুও যেতে দিতে হয়। ধরে রাখার মত অধিকার জন্মায়নি রামের।

জবা কালো অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

নিথর হয়ে শ্মশানের একপ্রান্তে রাম দাঁড়িয়ে। দীর্ঘশ্বাসে ঝাপসা ওর চোখ দুটো; বুকটা হাল্কা হয়ে গেছে।

এগার

জবা চলে গেছে। আবার ক্লান্তি নেমে এলো রামের জীবনে।

রামের পা টলছে। শ্মশানের চৌহদ্দির মধ্যে ফিরে যেতে মন চাইছে না। তবু যেতে হয়। কর্তব্য। এখুনি ডোমের খোঁজ শুরু হয়ে যাবে।

রামসেবক আদিগঙ্গার জলে ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। ফিরে আসে শ্মশানের চৌহদ্দির মধ্যে। বড় দেওয়ালটার ওপারে ছিল শান্তি; এপারে কান্নার জগৎ। রাম এসে দাঁড়িয়েছে কোমরে হাত

দিয়ে। মড়াটা নতুন একটা চাদরে মোড়া। নতুন খাট। বড়লোকের কোন গৃহবধূ। রামের দুঃখ হয়, সব থেকেও এদের কিছু নেই। এত টাকা, ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্সিংহোম কিছুই আটকে রাখতে পারে না জীবনকে। যে যাবার, সে যাবেই।

ডাক্তার এসেছে। বৌটার কোনও আত্মীয় চাদরটা সরিয়ে দিলে।

রাম চমকে উঠল, আগুনে ঝলসান মৃতদেহ।

ডাক্তার থানা থেকে পাঠান কাগজখানা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে।

একজন বললে, আত্মহত্যা।

ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেন?

ভদ্রলোক মৌন হয়ে রইল, জবাব দিল না।

ডাক্তার কাগজখানা নিয়ে চলে গেল।

রামকে কাঠ আনতে টাকা দিল একজন।

রামসেবক কাঠ আনতে গেল, মিনিট পনের ওরা বসে রইল গৃহবধূর লাশটাকে ঘিরে।

রাম মড়া-খেকো লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠ এনেছে।

এবার চুলি সাজিয়ে দিচ্ছে রাম।

বামুন এসেছে পিণ্ডি দিতে। একটা কচি ছেলে, বয়স দশ বার হবে, মুখে আগুন দিচ্ছে। পাঁকাটি জ্বলছে। চিতা জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা উঠলো আকাশে। একটু পরেই নাভিটা আদিগঙ্গার জলে ফেলে ওরা চলে যাবে।

রাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে,—ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ওর বাবা কাছে আসতেই ছেলেটার কান্না থেমে গেল।

একজন বললে, ওকে সরিয়ে নাও তুহিন।

বৌটার স্বামীর নাম।

তুহিন বললে, রথিন আয় আমার সঙ্গে।

রথিন তুহিনকে শ্মশানের বাইরে নিয়ে গেল।

ওদেরই একজন একটা বাঁশ দিয়ে মড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে চাতালে এসে বসল ; বললে, অনিতাকে শেষে মরতেই হল। তুহিন একটা স্কাউণ্ড্রেল। আশ্চর্য ! একটা শিক্ষিত লোক। ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, দেখতে ভদ্রলোক, কথাবার্তায় আদর্শ শিক্ষক। আবার সংস্কৃতি জগতের মাথা।

তুহিনের বন্ধুটা জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল,—লেখাপড়া শিখলেই মানুষ মানুষ হয় না। ও একটা হিংস্র নেকড়ের চেয়েও অধম। আমি কত দিন বলেছি, অনিতা একটু বেশী সেন্টিমেণ্টাল ; ওর সামনে তোর এ-সব করা ঠিক হচ্ছে না। কে কার কথা শোনে ; একদিন না দেখলেই তুহিন দীপাকে ফোন করবে। দীপার সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার পরেই ওদের ঝগড়াটা সপ্তমে উঠে। অনিতা বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল, ওর বাবা ডিভোর্সের মামলা করতে চাইলো, অনিতা কিছুতেই রাজী হয়নি। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে আবার স্বামীর কাছে ফিরে এলো। আরে বাবা তুইও তো একজন স্কুল-টিচার, না পোষায়, চলে যা। তা গেল না। অশান্তি বেড়েই চলল ; কিন্তু কি এমন ঘটল যে পুড়ে মরতে হবে। এখন শুনছি, তুহিন দীপাকে বিয়ে করেছে।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চলল, রথিনকে দেখে দুঃখ হয় ; ছেলেটা জুলিয়ান-ডে স্কুলে পড়ে। শুনেছি, পড়াশুনায় ভাল, বাপেরই মত ; ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু বাপের প্রতি ওর মনটা বিষিয়ে গেল তো !

তুহিন এ-সবের তোয়াক্কা করে না। বন্ধু জবাব দিলে।

রামসেবক এগিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে পড়া চুলিটা ঠিক করে দিলে। ভদ্রঘরের বৌ। হাসি পায় রামের ; সমাজটা কোন্ দিকে যাচ্ছে। কার উপর ভরসা করবে এখনকার মানুষগুলো !

রথিনকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে অধ্যাপক তুহিন চক্রবর্ত্তী।

রাম একবার ভাল করে দেখে নেয় তুহিনকে। সৌম্য মূর্ত্তি। সেকালের পণ্ডিত বুনো রামনাথের কথা মনে পড়ে যায়।

নিজের গ্রামের পাঠশালার বুড়ো গুরুমশাইকে মনে মনে প্রণাম করে ও।

অনিতার লাশ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কলসী করে আদিগঙ্গার জল ঢালছে তুহিন—নামী অধ্যাপক। রথিন জল আনছে গঙ্গা থেকে। ওকে সাহায্য করছে তুহিনের বন্ধুরা। তুহিনের বন্ধু ভাগ্য ভালই।

রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রায়ই দেখে ও এমন দৃশ্য। আবার নতুন মড়া আসে। পট পরিবর্তন ঘটে। পুরান কথা ভুলে যায় ও। রোজই তো কত মড়া আসছে! সব কথা মনে রাখা সম্ভব নয়। বৌটাকে কেমন দেখতে ছিল কে জানে! হয়ত সুন্দরী; অথবা নয়। জবার সঙ্গে চেহারায় একটু মিল খুঁজে পেয়েছে রাম। জবার ভরা যৌবন। মেয়েটারও ভরা যৌবন ছিল। হয়ত পরে ফুলে উঠেছে,—তাই জবার মত যুবতী দেখাচ্ছিল। বৌটা পুড়ে মরল,—বলার কিছু নেই। বড়লোকের বৌ, ভদ্রলোকটার কিছুই হবে না। ও আবার নতুম বৌ নিয়ে ঘরসংসার করবে। ছেলেটা হোষ্টেলে থাকবে। কারও মড়া পোড়াতে আসবে আবার হয়ত কখনও। হয়ত জবার ওখানে চুল্লু খেতে যাবে, বন্ধুদের সঙ্গে। ও একদিন হয়ত ওর কোনও বান্ধবীকে বিয়ে করবে, অথবা করবে না। ওর বাপকে দেখে ও হয়ত শিক্ষা লাভ করবে, ঘৃণা করবে ওর অধ্যাপক বাবাকে। হয়তবা মিশনারীদের খাতায় নাম লেখাবে; দুর্ভিক্ষ—বন্যা হলে মানুষের সেবা করতে যাবে নির্ভয়ে। জীবনটাকে বিলিয়ে দেবে মানুষের সেবায়।

রামসেবক তখন বুড়ো হয়ে যাবে; আগুনের সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হয়ত আরও বেশী চোলাই খেয়ে পড়ে থাকবে আদিগঙ্গার ঘাটে। জবার হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে অন্য কারুর সঙ্গে। জবার বাপও একদিন মরবে। জবার বয়সটাও যাবে বেড়ে।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। একটু পরেই সোনার বলের মত সূর্য উঠবে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দিরটার গা বেয়ে।

রাম পায়ে পায়ে নতুন কংক্রিটের সাঁকোটা পেরিয়ে উরুক্রম মঠের চাতালে চলে এলো।

সাধু ঘুমুচ্ছে অচৈতন্য হয়ে দরজায় খিল এঁটে।

আদি-গঙ্গায় আবার ভাঁটা শুরু হয়েছে; পচা জলের গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে এপারে।

বার

সন্ধ্যা হয় হয়। জবার প্রতিবেশিনীদের সাজ-গোজের পালা সাঙ্গ হয়েছে অনেক আগেই। একে একে ঠাকুর প্রণাম সেরে ওরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সরুগলিটার মোড়ে।—ল্যাম্প-পোষ্টের আলোটা যেখানে তেরচাভাবে পড়েছে—তারই আশেপাশে। ওদের নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম চালু হয়ে আসছে; যে আগে আসবে, সে আগে দাঁড়াবে ল্যামপোষ্টের কাছ ঘেঁসে। পরপর লাইন দিয়ে থাকবে, একজনের খদ্দেরকে অন্য কেউ টানাটানি করবে না।

রামসেবক এসেছে একটু আগেভাগে। দেরী করে এলে ওদের নানান উক্তি শুনতে শুনতে গা ঝি-ঝি করে উঠে। মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না ও।

জবা দরজায় খিল এঁটে টিকলিটা দেখছে নেড়ে চেড়ে। রামের প্রতি শ্রদ্ধায় ওর মনটা নুয়ে পড়ে। রামকে ঠিক এ-কাজে মানায় না। ও যেন একটা ভিন্ন জগতের মানুষ, হঠাৎই এসে পড়েছে—এ পাড়ায়। রামের নিশ্চয়ই একটা অতীত আছে। কোথায় ওর জন্ম কে জানে? ওর দেশ কোথা? কেন একাজ বেছে নিলে, কিছুই জানে না ও। রামের মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি ওর ব্যবহার, নরম মন, জবার জন্যে ওর অনুভূতি জবাকে অভিভূত করে। জবা টিকলিটা সিঁথির মাঝখানে রেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে।

রাম দরজায় ধাক্কা দেয়।

জবা টিকলিটা আবার কাঠের বাক্সে তুলে রেখে দরজা খোলে। ও রামের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

রাম জবার কাছে এগিয়ে যায়।

জবা সরে গিয়ে চোলাই ভরা কলসীর পাশে বসে, বলে, আজ এত সকাল সকাল এলে যে?

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মনটাও। শুয়ে ছিলাম। আবার রাতে ডিউটি দিতে হবে। আর ভাল লাগে না এ সব। দিন রাত শুধু মড়ার মিছিল। মানুষের দুঃখ দেখে দেখে বুকটা পাথর হয়ে গেছে। শুধু ভাবছি—দিন দিন আমরা কোথায় চলেছি! কাল একটা মড়া এসেছিল, একটা অল্প বয়সের বৌ; মেয়েটার স্বামী নাকি খুব শিক্ষিত। হায়রে! সবাই দেখছি সমান: মানুষগুলো পশু হয়ে যাচ্ছে। বৌটা পুড়ে মরল। ছেলেটা কাঁদছে। শিক্ষিত স্বামীর মনে কিন্তু কোনও দাগ কাটেনি। থাক ও সব কথা। দে এক গ্লাস। শরীরটাকে চাঙ্গা করে নি। আবার তো সারারাত মড়া ঠেলতে হবে।

জবা একগ্লাস রামের হাতে তুলে দেয়। আঙ্গুলে আঙ্গুলে ওদের কথা হয়। এবার রামের ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ শুরু হয়ে যায়। চোলাই-এর গ্লাসটা আঙ্গুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কাঁপছে। রামসেবক বললে, জবা, টিকলিটা পরে আয়, তোকে দেখি, বড় ভাল লাগেরে।

তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখুনি আরও খদ্দের আসবে। পাঁচজন পাঁচটা কথা বলবে—জায়গাটাও ভাল নয়।

হঠাৎ পাশের ঘরে মড়া কান্না শুরু হয়ে যায়,—আমার কি হল গো। এ তুই কি করলি রে, আমার আর যে কেউ রইল নারে— ইত্যাদি। এর পরেই চাপা গুঞ্জন।

রাম খালি গ্লাসটা পাশে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

জবা বলে, তুমি বস, আমি দেখছি: এখানে প্রায়ই ঝামেলা হয়; হয়ত পুলিস এসেছে।

জবা সাত তাড়াতাড়ি চোলাইয়ের কলসীটা ভেতরের ঘরে রেখে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

রামসেবকের নেশা চটে যায়, ও বোকার মত বসে বসে ভাবে :—কি আবার হল ওখানে। একবার গেলে মন্দ হত না। হয়ত কেউ মারা গেছে। কিন্তু কেন? কি এমন হল? ভাবনায় রামের কপালের শিরাটা টাটিয়ে উঠে। ও একবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। ওখানটায় বেশ্যাদের ভীড় জমেছে। ওরা উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে। কি দেখছে, কে জানে? জবা গেল কোথায়? অনেক দেরী করছে। ঘর ছেড়ে যেতেও পারছে না ও। জবা ভার দিয়ে গেছে।

এ পাড়ার একটা ছেলে ছুটে গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাম ডাকলে চিৎকার ক'রে। ছেলেটা কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল।

রাম আবার গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। জবার দেখা নেই। গোলমালটা বাড়ছে। কান্না থেমেছে। গুঞ্জন থামেনি। আরও লোক আসছে। গলিটা গম্‌গম্ করছে। রামের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে। ও একবার ভাবে, সব ফেলে রেখে ওখানে ছুটে যায়, নিজে চোখে দেখে আসে, আবার পরক্ষণেই ভাবে, না ঘরদোর খালি রেখে যাওয়াটা উচিত হবে না। কিন্তু ওখানে জবা করছেটা কি? ওদিকে আবার শ্মশানে কেউ নেই, এখুনি খোঁজা শুরু হয়ে যাবে। এখানে চোলাইয়ের কলসী পাহারা দেওয়ার জন্যে মাইনে পায় না ও।

রামসেবক উঠে পড়ে। না, আর দেরী করা চলে না।

হঠাৎ জবা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। আলুথালু বেশ। একটা ঝড় বয়ে গেছে। চোখদুটো বিস্ফারিত। কিছু প্রশ্ন করার আগেই ও বললে, টগরের ছেলেটা গলায় দড়ি দিয়েছে। বাপ রে দেখা যায় না। টগরকে ধরে রাখা যায় না। ওকে বোঝাচ্ছিলাম। কিন্তু কি দিয়ে বোঝাব বল! অমন ছেলে। জোয়ান। চোখের সামনে ঝুলছে। পুলিশ এখনও আসে নি। পাশের বাড়ীর শ্যামবাবু ফোন করে দিয়েছেন।

কেন হঠাৎ গলায় দড়ি দিতে গেল? রামসেবক প্রশ্ন করে।

জবা বলে, টগরকে দেখতে ভাল নয়। ওর ঘরে বড় একটা

কেউ ঢোকে না। রোজকার দু'বেলা খাওয়া জুটত না। ছেলেটা বড় হয়েছে। মাকে এসব থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে অনেকদিন থেকে। মা গোপনে এখান ওখান ঘুরে কিছু রোজগার করে আনত। তাতেই মাঝে মাঝে কিছু জুটতো; তারপরে সবাই ওকে কিছু কিছু সাহায্য করত। ছেলেটা ঘুরতো চাকরির জন্যে; সারাদিন ঘুরে বাড়ী এসে টগরকে দেখতে না পেলে ক্ষেপে উঠত। কতদিন বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। টগরও বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকেছে। যখন একান্তই শুকিয়ে মরার অবস্থা হয়েছে, তখনই আবার পথে বেরিয়েছে। আজও সন্ধ্যে হওয়ার আগেই টগর বেরিয়েছিল; ছেলে ফেরার আগেই অর্থাৎ সন্ধ্যের পরেই টগর বাসায় ফিরে দেখে ছেলেটা গলায় গামছা বেঁধে ঝুলছে। বাপরে এ দৃশ্য দেখা যায় না। টগরটা পাগল হয়ে যাবে। ভগবান মানুষকে কত দুঃখ দেয়। কিন্তু এই দুঃখ দেখার কেউ নেই। কেউ বোঝে না এখানকার মেয়ে মানুষ-গুলোর দুঃখ।

জবা চোলাই-এর কলসীটা পাশের ঘরে তুলে রেখেছিল। আজ আর এ-সব বিক্রি করতে ওর মন চাইছে না।

রামসেবকও আর এক গ্লাস চাইল না। ও মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো জবার ঘর থেকে। মাথাটা ঘুরছে। আর ভাল লাগে না,—এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। রামসেবক পথ চলে। ওর চলাটা বড় শ্লথ। ওর পা দুটো এখানের পিচ ঢালা রাজপথে, মনটা জবার—টগরের ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার মধ্যে।

রাম শ্মশানে ফিরে আসে। এখানটায় শান্ত। শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে। মড়া আসেনি একটাও।

রাম গিয়ে বসে আদিগঙ্গার শান বাঁধান ঘাটে। পচা নর্দমার জলের গন্ধ ছাড়ছে। পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পোড়া কাঠের টুকরো। একরাশ ছাই। একপাশে ময়লার পাহাড়।

রামসেবক এখানের এক কোণে বসে রইল পরম শান্তিতে। ও মনে মনে ভাবে. আর যাবে না ও পাড়ায়। জবা যদি আসে দেখা

হবে, না এলে হবে না। ওখানে কান্নার মিছিল, এখানে শান্তির সমাধি।

অন্ধকারটা গাঢ় হ'য়ে আছে। একটা বুনো গাছের ডাল আদি-গঙ্গার মাথার উপর ঝুলে পড়েছে। ঝুলে পড়া গাছের ফাঁক থেকে আকাশের তারাগুলো উঁকি ঝুঁকি মারছে।

রামসেবক টগরের কথা ভাবতে বসল। হঠাৎ হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্তস্রোত দলা পাকিয়ে উঠে। বুকের মধ্যিখানে একটা অব্যক্ত বেদনা।

রামসেবক এই নিরালা একাকীত্ব সহ্য করতে পারে না। ও ছুটে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়। একবার ভাল করে উত্তর-দক্ষিণ দেখে নেয়।—কোনও মড়া আসছে কিনা।

না। মড়া আসার কোনও চিহ্ন নেই। এখানে মানুষ চলেছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ এর মতন। একটা কুকুর ম্যানহোলের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। পাশের বট-গাছটার নতুন পাতা রাস্তার আলোয় ঝিলিক মারছে।

ডাক্তার বসে বসে মড়ার হিসেব লিখছে। চিত্রগুপ্তের খাতাটা সামনে মেলা। একশ' পাওয়ারের আলোটা খাতার মধ্যিখানে ঝুলছে—অনাদি কাল থেকে। লোকটা পয়সার লোভে ছুটিও নেয় না। ওর বৌটা নিঃসঙ্গ খাটটায় শুয়ে শুয়ে কার কথা ভাবছে কে জানে! ওর উপোসী মন ডাক্তারের জন্যে হা-পিত্তেস করে জেগে আছে বলে তো মনে হয় না।

রাতটা একটু একটু করে আরও গভীর অন্ধকারের ডানা মিলছে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে। সামনের চায়ের দোকানের তের বছরের ছেলেটা কচুরী ভাজার কড়া মাঝছে ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ তুলে। রামসেবক একা এই নিরালা রাতে তের বছরের ছেলেটাকে দেখছে এক মনে। ভাবছে, এই বাচ্চাটারও একটা কাজ জুটেছে আমাদের এই স্বাধীন দেশে।

ফুটপাথের ধারের নর্দমাটায় জল নেই। ওরই পাশের পাথরটায়

জুত করে বসে রামসেবক। আর এক গ্রাস খেলে মন্দ হত না। টগরের জোয়ান ছেলেটা কেন যে গলায় দড়ি দিল। ও ওর মাকে বাঁচাতে পারেনি। হায় এই ওর আক্ষেপ। এ দেশে মাকে বাঁচান শক্ত ব্যাপার। গুজরাটিগুলো মুঠো মুঠো পয়সা ওড়াচ্ছে। এত টাকা-পয়সা ওরা পায় কোথা? অথচ সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্যে ছেলের জন্যে মাকে ওই সব পয়সাওয়ালা মানুষগুলোর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হয়। ছেলে মরে গলায় দড়ি দিয়ে।

ঘুমে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে; রামসেবক গামছাটা মেলে দেয় ফুটপাথের উপর। ঘুম নেমে আসে দু-চোখ বেয়ে। রাম ঘুমিয়ে পড়ে। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জবাকে দেখছে। জবা এসে বসেছে মাথার কাছটায়, টিকলিটা দুলছে কপালের মাঝখানে। আজ ওকে দেখাচ্ছে গোলাপের পাপড়ির মতন। ও চুল বেঁধেছে নতুন ছাঁদে। খোঁপার পাশে ঝুমকোর মত দুলছে লাল একটা পঞ্চমুখী জবা। কাজল পরেছে চোখে। মেহেদীপাতার রং মেখেছে হাতে, আজকের রাতটা কত সুন্দর। রাম ওর প্রিয়তমাকে দেখছে দু-চোখ ভরে। কাজলটানা চোখ দুটো যেন ভোরবেলাকার আকাশের শেষ তারা। আলতাপাটি শিমের রং ধরেছে ওর দুটো গালের উপরটায়। রাম ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জবা এসেছে বুকের কাছটায়। আজ আর কাছে টেনে নিতে মন চাইছে না। শুধু দু-চোখ ভরে দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে। ও আজ রাত্রিবেলার সাথী।

কড়া মাজার ঘস্‌ঘস্‌ শব্দটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ছেলেটা দরজায় অর্গল এঁটে শুয়ে পড়েছে দুটো বেঞ্চ এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।

রামসেবক জবার দুটো হাত মুঠো করে তুলে নেয়।

কানে এসে বাজছে একটা শব্দ।

রামসেবক কানখাড়া করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করে। খুব পরিচিত বলে মনে হয় ওর।

জবা একটু একটু করে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

শব্দটা এবার স্পষ্ট কানে এসে বাজল—একই শব্দ—ছন্দ—সেই বোল হরি, হরি বোল।

রাম খাড়া হয়ে দাঁড়াল। শালারা আর সময় পেল না। সবে জবা বুকের কাছটায় মুখ নিয়ে এসেছিল বুকের শব্দ শুনতে।

চারজনে মড়াটাকে গলি বেয়ে শ্মশানের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

দুটো অল্প বয়সের ছোকরা ডাক্তারকে কাগজপত্র দেখাচ্ছে। হয়ত ডেথ্ সার্টিফিকেট্।

ডাক্তার চিত্রগুপ্তর খাতাটার উপর কাগজটা মেলে ধরে মন দিয়ে পড়ছে। একটা ছোকরা ডাক্তারের কানে কানে কি যেন বললে; ডাক্তার রেগে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

রাস্তাটায় মানুষ জন নেই। নেড়ীকুকুরটা এখনও ঘুমুচ্ছে। এক গ্লাস হলে মন্দ হত না। এখুনি আবার মড়া ঠেলতে হবে। সবে ঘুমটা ধরে ছিল। স্বপ্নে জবা এসেছিল। ভাগ্যে সইল না। স্বপ্নটা মাঠে মারা-গেল। রাতে কাজটা মন্দ নয়। ভীড় কম থাকে। ঝামেলাও কম।

রাম শ্মশানের চার দেওয়ালের মধ্যে ঢোকার আগে রাস্তার কল থেকে একটু জল নিয়ে মুখে চোখে দেয়। আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। এই একঘেয়ে জীবনের শেষ কবে যে হবে, কবে যে ওর চুলি ধরাবে মধু। এর জন্যে দিন গুণতে আর ভাল লাগে না। জবাটার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। রাম মলে জবার বিয়ে হয়ে যাবে অন্য কারুর সঙ্গে। ওর বাপটা বেঁচে আছে তাই; নইলে এত দিন লাইন লাগাত জবা—ওই বেশ্যামাগীগুলোর সঙ্গে গলিটার মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টটার পাশে। ওর যৌবন এখনও আছে। ভরা যৌবন। চামড়াটা টান টান। ভাঁজ পড়েনি একটুও। ভালই রোজগার হত জবার।

রাম শ্মশানের খালি চিতাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব সাতপাঁচ ভাবে।

ডাক্তার দেখছে মড়াটাকে টর্চ ফেলে; সঙ্গে রাম।

রামসেবক চিৎকার করে উঠে, একটা হাত কোথায়?

একজন জবাব দিলে, খুঁজে পাওয়া যায় নি।

রাম আবার চিৎকার করল, অসম্ভব। কাটা হাত না আনলে মড়া পুড়বে না।

ডাক্তার কিছু না বলে নিজের দপ্তরের দিকে চলে গেল।

ওদেরই একজন রক্তমাখা পুরান কাপড়টা দিয়ে মড়াটাকে আবার ঢেকে দিলে।

শববাহকদের একজন রামের হাতদুটো ধরে অনুরোধের সুরে বললে, ভাই বাঁচা! পেটো তৈরী করতে গিয়ে মরেছে। থানাকে ম্যানেজ করেছি। ডাক্তার ডেথ্-সার্টিফিকেটও দিয়েছে। তুই শুধু রাজী হলে—।

এ সব করে কি হবে; রাম ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ছোকরা জবাব দেয়, এ ছাড়া তো পথ দেখছি না।

রাম ক্ষেপে উঠে, যাও যাও; লম্বা চওড়া বক্তৃতা অনেক শুনলাম। শালা সব বেইমান।

ডাক্তার ফিরে এসেছে, রাম চুলি সাজা।

রাম মাথা নীচু করে কাঠ আনতে গেল।

অন্ধকারের বুক চিরে আগুন জ্বলে উঠলো।

শ্মশানের স্তব্ধতা ভাংলো শহিদের চিতায়।—কমরেডদের নীরব শেষ সেলামে।

রাম ঘাটের ধারে বসে টগরের ছেলেটার কথা ভাবছে। ওই ছেলেটাও মরল। ওর বাঁচা বা মরার কোনও খবর জানলো না দুনিয়াটা। হায় রে! এই নতুন মড়াটার দুঃখে কেউ কান্না জুড়ে দিল না। মিছিল বের হল না রাস্তায়! খবরের কাগজে এক টুকরো খবর ছাপলো না কাগজওয়ালারা। রাম মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কামনা জানায়,—হে ঈশ্বর, শুনেছি মানুষ মরলে আবার জন্মায়; তুমি আমায় দেশের নেতা করে জন্ম দিও। ডোম জন্ম আর যেন না হয়। মড়া ঠেলে ঠেলে এ জন্মের যেন শেষ হয় ঠাকুর। নেতা মরলে মিছিল হয়, কত লোক হাপুস নয়নে চোখের জল ফেলে। পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয় মড়াটাকে। ছাই পুতে মন্দির তৈরি হয়; খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়।

অনেক দিন হয়ে গেল!—কোন নেতা মরেনি। কি যে হল!

এক পক্ষে ভালই হয়েছে। নেতা মরলে ঝামেলা অনেক। নেতার মড়া নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে; সাধারণ মানুষের মড়া পুড়তে দেরী হয়। মড়াগুলো পচে ঢোল হয়ে যায়। একবার এক নেতার মড়ায় আগুন জ্বালাবার জন্যে রামের ডাক পড়ে। রাম ভাল করে চুলি সাজিয়ে পাঁকাটি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। মড়ার ছবির সঙ্গে রামের ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। সেদিন ডাক্তারবাবু ডেকে ওকে মিষ্টি খাইয়েছিল। এক দিনের জন্যে ও বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই ছবিটা দেখিয়েছিল রামকে। রাম কাগজটা এনে জবাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'দেখ জবা তোর রামের ছবি ছেপেছে কাগজ-ওয়ালারা।' জবা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, 'ডোমের আবার ছবি!' কথাটা রামের বুকে বিঁধেছিল খুব। সারারাত ঘুমতে পারেনি ও। চোলাই খেয়েছিল চার গ্লাস—নেড়া সাঁকোটার নীচে গিয়ে।

পরের দিন সকালে রাম কাগজখানা মেলে ধরেছিল উরুক্রম মঠের চাতালে; অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে দেখেছিল নিজের ছবিটা। সাধু উনুনে আঁচ ধরানোর জন্যে কাগজ খুঁজছিল, রাম এগিয়ে দিয়েছিল ওটা। পুরান কাগজখানা জ্বেলে দিয়েছিল সাধু। ও পুড়ে গেল। নেতা আর রাম এক সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এটাই তো স্বাভাবিক! সবাইকে পুড়তে হবে এই মহাশ্মশানের চুলিতে। সে বড় নেতাই হোক, আর ভিখিরীই হোক। পরিণতি এক জায়গায়। অনেক বড় বড় সাধু দেখেছে রাম তার জীবনে। দাড়ি, গেরুয়া পোষাক; অনেক অনেক শিষ্য, হায়রে! এই রামের কাছে আসতে হয়েছিল, তাদের মহারাজের জন্যে কাঠ এনে চুলি সাজাবার জন্যে।

এই রাম, মড়াটা ঝুলে পড়েছে। একটু খুঁচে দে না ভাই। শব-বাহকদের একজন অনুরোধ জানালে।

রাম উঠে দাঁড়িয়েছে। বাঁশ দিয়ে মড়াটাকে ঠিক করে দিয়ে আবার ঘাটে এসে বসল।

আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। মড়ার বন্ধুরা চুল্লিতে জল ঢেলে প্রণাম করল হাঁটু গেড়ে। চুলিটাকে প্রদক্ষিণ করল। সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে চুলি ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করল। বন্ধু তোমায় ভুলব না; লড়াই আমাদের চলবে। · · ·

সকালের নতুন সূর্য আলো ছড়াচ্ছে।

রাস্তায় মানুষ জনের চলা শুরু হয়ে গেছে।

চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে ছোকরাটা।

রাম এসে দাঁড়িয়েছে দোকানটার সামনে।

রাম ওদের প্রথম খদ্দের।

এক গ্লাস চা দিল ছোকরাটা।

রাম মুখেচোখে জলের ছিটে দিয়ে এসে চায়ের গ্লাস নিয়ে বসল ফুটপাথের নড়বড়ে বেঞ্চটায়। আজ একটু দেরী হয়ে গেল। এতক্ষণে সাধু হয়ত উঠে পড়েছে। রাম চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে নেড়াপুলটার উপর এসে দাঁড়াল।

চুলিটা থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

তের

আজ এত দেরী করলি যে? সকাল থেকে গলাটা শুকিয়ে রয়েছে। পুজো হয়ে গেছে। একটু চা এনে দে।

রাম দেরী হওয়ার জন্যে কোনও কৈফিয়ৎ দিল না। চায়ের গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এমন দেরী ওর মাঝে মধ্যে হয়; এসব সাধুর জানা আছে। এর জন্য কোনও কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না।

রাম চা আনতে গেছে। সাধু চালা-ঘরের এক কোণে গুটিয়ে দেওয়া কম্বলটার পাশে এসে বসে। আজকাল রামটা কেমন যেন হয়ে গেছে। কথা কম বলে, একটা অনীহা সমাজ-সংসারের প্রতি। রামটা কি শেষে সাধু হয়ে যাবে। হাসি পায় সাধুর! ডোমও সাধু হতে চলেছে। কলিকাল পেরিয়ে সত্যযুগ কি শুরু হয়ে গেল! আকাশের নীল রংটা দেখা যাচ্ছে না। সূর্যের আলোয় একটা ঘোলাটে ভাব। বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে। গরমটাও চুটিয়ে পড়েছে। দু-ফোঁটা

হলে ভাল হয়। মশার দাপট বাড়ছে। আদিগঙ্গায় একটু জল বাড়লে মন্দ হত না। সেই বেলা চারটের আগে জোয়ারের জল আসবে না। কাল থেকে পচা গন্ধটা বেড়েই চলেছে। না, এখানে আর টেকা যাবে না। অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে। না! না! এসব কি ভাবছে/ও, এখানেই অর্থাৎ এই নরকেই থাকবে অনন্তকাল। যতক্ষণ না একটু শান্তি পায় অর্থাৎ পুড়ে পুড়ে দেহটা ছাই হয়ে যায়, ততকাল। রামটা থাকলে হয়। পোড়ার জন্যে কোনও অসুবিধের মুখোমুখি হ'তে হবে না। বেটা দেরী করছে। এলোও তো দেরী করে, গলাটা শুকিয়ে টা-টা করছে। গরমটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। এর পর কখন যে বাজার যাবে। কি-বা পাবে বাজারে। বেটা একটু নড়ে দূরে কোথাও যাবে না। এখানের উদ্বাস্তু-বাজারে যা পাবে নিয়ে আসবে। ওর স্বাধীন ইচ্ছেতে বাধা দেয় না সাধু। রাম নিজে থেকে যেটুকু করে সেটুকুই যথেষ্ট। এখানে পরম শান্তি। নিধুবন। এখানের মোহ ছাড়া যায় না। বউটা ছেলেটা এখানেই মিলিয়ে গেল পঞ্চভূত। অনেকদিন হয়ে গেল। কবে যে ওদের কাছে যাওয়ার সময় হবে তাই ভাবছে। সাধুর ভাবনার আর শেষ নেই; ও পরম শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

রাম চা এনেছে।

সাধুর এলুমিনিয়ামের গ্লাস থেকে ও নিজের ভাঁড়ে একটু ঢেলে নেয়।

চা পর্ব শেষ করে রাম জুতকরে বসে, সাধুর সামনা সামনি—দরজার চৌকাঠের পাশে।

সাধু প্রশ্ন করে, বাজার যাবি না?

রাম জবাব দেয়, যাব, কাল সন্ধ্যের দিকে একটু ঘুম এসেছিল, তারপর—সারারাতে একটু শুতে পারিনি। খুব ক্লান্ত। একটু বসি।

সাধু বাধা দেয় না।

রামের মনে একটা প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই দলা পাকিয়ে উঠেছিল, সময় পায়নি বলতে, এবার ও মনের কথাটা ব্যক্ত করে ফেলল সাধুর

কাছে,—আচ্ছা গুরু বলতে পার, কচি কচি ছেলেগুলো পেটো তৈরী করতে গিয়ে মরছে কেন? কি হবে এ-সব করে।—এর চেয়ে বিয়ে করে বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর করলেই পারে।

গুরু এবার জুত করে বসে রামকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, ক্ষুদিরাম,—ঋষি অরবিন্দের নাম শুনেছিস, ওরাও এই সব বোমা-পেটো তৈরী করত।

সে তো সাহেবদের মারার জন্যে। এরা করে তো নিজের ভাইকে মারার জন্যে।

কথাটা সত্যি। ওরা বৃটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্যে এসব তৈরি করত; আর এরা করে নিজের দেশের লোককে মারার জন্যে। তোকে কি করে বোঝাই বলত। শোন, বৃটিশরা চলে গেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি; কিন্তু অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা আমাদের হাতে আসেনি। এখন কিছু লোক দেশের সম্পদকে ভোগ করে। আর বেশীর ভাগ মানুষ বঞ্চিত হয়। খেতে পায় না। চাকরি পায় না। লেখাপড়া শিখেও বেকার হয়ে ঘুরে মরে। আর ওই সব মুষ্টিমেয় কিছু বড় লোকের কারখানায় কাজের জন্যে ধর্ণা দেয়। আর ওই সব ধনী শোষকদের শোষণের মদত দেয় বড় বড় নেতা, তবে সবাই নয়, অনেকে শোষণটাকে জিইয়ে রাখতে চায়; এই শোষণ থেকে মুক্তি না পেলে আমাদের মুক্তি নেই। স্বাধীনতা পেয়েও আমরা পরাধীন। আর এই বর্তমান শোষকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কিছু বলিদানের প্রয়োজন আছে। অন্য এক সময়ে তোকে বুঝিয়ে সব বলব, এখন একবার বাজারের দিকে যা। দেখছিস না বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজও বাড়ছে। এর পরে বাজারে গিয়ে আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

রাম উঠে পড়ে। বাজারের থলি নিয়ে উদ্বাস্তু-বাজারের দিকে পা বাড়ায়। ওর কানে বেজে চলে,—'বর্তমান শোষকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কিছু বলিদানের প্রয়োজন আছে।'—কিছু বলিদানের প্রয়োজন আছে—কানে বেজে চলে কথাগুলো, কিন্তু সব কথার মানে

বোঝে না ও। রাম বাজারের থলি হাতে পটল বাছতে বাছতে দাম জিগ্যেস করে, দোকানী বলে, চার টাকা।

বলিস কিরে? তোরা দেশটাকে কোথায় নিয়ে চললি? রামসেবকের প্রেসার বেড়ে যায়।

আমরা! পটলওয়ালা হাসলো। বললে, একদিন আমার সঙ্গে চল, দেখবি কত মজা; সারারাত কোলেবাজারে ভীড়। মারামারি করে মাল কেনা। তারপরে ফুটপাথে চোখ বন্ধ করে ঝুড়ি ধরে বসে থাকা। ভোরের বাসে মাল তুলে বাজারে আসা। কিছু বিক্রি হল, কিছু শুকনো হ'ল, আর কিছু পচল, সারারাত ডিউটি দিয়ে পেট ভরল না। তবুও করে যাই। তোদের মত দু-পয়সার খদ্দেরের কথা শুনি। 'হায়রে দেশটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি'? কিছু করার ক্ষমতা যদি থাকত, তবুও তো বুঝতুম একটা কিছু করলুম।—দেশটাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিলুম। সে ক্ষমতাও নেই। যাদের আছে, তারা তো জাহান্নামের দিকেই দেশটাকে ঠেলে দিচ্ছে। নেতা আর তার চামচা গুলো হয়েছে শকুন। দেশের অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। মড়া! এই মড়াটাকেই টেনে টেনে খাচ্ছে। এরপর হাড়-পাঁজড়াগুলোও চিবুবে। তোর আমার জন্যে আর কিছুই আস্ত রাখবে না রে।

রামসেবক পটলের দাম মিটিয়ে দেয়; ওই আনাজওয়ালার কথা-গুলোর মানেও বোঝে না। মনে মনে বলে, শালা মূর্খের অনেক জ্বালা, সাধুর কথাও বোঝে না, পটলওয়ালার কথাও বোঝে না। গাঁজা না খেয়েও মাথাটা গাঁজা খোরের মত হয়ে গেছে।

রাম ফিরে আসে।

সাধু চুলো ধরিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বাজার যাওয়ার আগের কথাগুলো এখনও রামের মাথায় চক্কোর খাচ্ছে। মানেটা পুরোপুরি না বোঝা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। কিন্তু, কেমন করে ও সাধুকে বলে যে, ওর মাথায় গোবর পোরা আছে, ভেঙ্গে মানে করে দিলেও মানে বোঝে না; সামান্য পটলওয়ালা ওকে কি সব বলে গেল, তারও সব মানে বোঝেনি।

সাধু থলেটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে,—আহা কি বাজার করার ছিরি! সাধে কি আর ডোম বলে। শালা মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে মাথার ঘিলুটাও পুড়িয়ে ফেলেছে। শুধু আলু আর পটল। এ দিয়ে কি রান্না হবে সাধু ভেবে পায় না। সাধু হাসে!

সাধুর হাসি দেখে রামের সন্দেহ হয়; ও বলে, গুরু হাসলে যে!

কেন হাসব না বল, এ দিয়ে আমি কি রাঁধবো?

কেন পটল ভাজা আর আলু পটলের ঝোল। সঙ্গে গরম ভাতে গাওয়া ঘি।

সাধু আবার হাসল। যা আনাজগুলো ধুয়ে এনে কুটনোটা কুটে দে।

এক বালতি জল সাধু রাস্তার কল থেকে তুলে রেখেছিল, রামসেবক সেটার সদ্ ব্যবহার করলে এবার। কুটনো কুটতে কুটতে ও বললে, গুরু একটা কথা জিগগেস করব? রাগ করবে না তো?

বল না কি তোর কথা? রাগ করার কি আছে?

তুমি যে বললে, 'বর্তমান শোষকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কিছু বলিদানের প্রয়োজন আছে।' এর মানেটা আমি কিছুই বুঝলাম না।

শোন তবে বলি। সাধু একটা ছেঁড়া কম্বলের আসন ঘরের ভেতর থেকে এনে রামের মুখোমুখি বসে বললে, বৃটিশের রাজত্ব থেকেই বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য না করে চাকরি করার দিকে ঝুঁকে পড়ল, আর একটু একটু করে ব্যবসাটা অবাঙ্গালীর হাতে চলে গেল। আমরা পেছনে পড়ে রইলাম। ওরা ব্যবসা করল, লক্ষ্মী ওদের ঘরে বাঁধা রইল; দেখছিস তো গুজরাটি মাড়োয়ারীরা মুঠো মুঠো টাকা ওড়াচ্ছে।

কেন দেখব না, ওদের মড়া এলে ভীড় লেগে যায়। মুঠো মুঠো পয়সা ছড়ায় ওরা।

এতো দেখছিস ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পয়সার গরম। ওদের মধ্যে যারা সারাজীবন অধর্ম করে যা রোজগার করে, তার কিছুটা দান করে ওরা ভাবে সব পাপ ধুয়ে গেল। শোষণ না করলে এত টাকা

আসবে কোথা থেকে ? এই শোষণ ওরা দু-ভাবে করে থাকে, প্রথম হচ্ছে ওদের কারখানার মজুরদের ওরা কম মাইনে দিয়ে, আর দু-নম্বর হচ্ছে, খারাপ অর্থাৎ নীচুমানের মাল বাজারে ছেড়ে ; ওদের কারবারে সাহায্য করে আমদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, যারা ওদের মোটা লাভের একশ ভাগের একভাগও পায় না ; এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কিছু কিছু সরকারী আমলা ; আর কিছু রাজনৈতিক নেতা আছে, যারা কিছু চাঁদার লোভে এই সব টাকার পাহাড়কে রক্ষার জন্যে দারোয়ানের কাজ করে। কিছু কিছু আইনজীবী, যারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বুদ্ধি বলে ওদের রক্ষা করে—এটা অবশ্য ওদের পেশা ; কিন্তু যারা সামান্য চাঁদার লোভে ওদের মুনাফা লাভে সাহায্য করে, তাদের কিন্তু ক্ষমা করা যায় না। তোর ওই টগরের ছেলেটার কথা একবার ভাবতো ; এতবড় একটা রাজ্য, এত কল-কারখানা, একটা গাড়ী ধোয়ার চাকরিও তো ও পেতে পারত ; তাও পেল না ; কেউ দিল না ; অথচ ওর মাকে রাতের অন্ধকারে মুঠো মুঠো টাকা দিতে ওদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কার্পণ্যই করবে না। এবার তুই কি বলিস, ওদের শোষণ কি চলতে দেওয়া উচিত ? তুই আমি কিছুই করব না, করিও না, কিছু কিছু লোক এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গার, এই সব শোষকদের হাত থেকে তোকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে দিন রাত ভাবনা-চিন্তা করছে। ওদের মরতে দে রামসেবক ! রক্ত না ঝরলে কিছু হবে না। মায়ের কাছে বলিদানের প্রয়োজন আছে।

রামসেবক চুপ করে বসে থেকে সাধুর কথাগুলো শুনছিল, বুঝতে চেষ্টা করছিল, ওর শিরাগুলো শক্ত হয়ে উঠছিল।

সাধু বললে, নে রে, বসে না থেকে আনাজটা কুটে ফেল, আঁচ ধরে গেছে অনেকক্ষণ, আজ খিদেটাও পেয়েছে বেশী করে।

সাধু ভাত বসিয়ে দিলে একটা মাটির হাঁড়িতে। রামসেবক কুটনো কুটতে শুরু করল এক মনে।

চোদ্দ

সারাদিন ঘুম এলো না রামের। সাধুর কথা, আনাজওয়ালার কথা, ওই হাতকাটা ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে এলো।

রাম মনে মনে ভাবলে, আজ আর চোলাই খেতে জবার কাছে যাবে না; আর নেশা করবে না ও। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সন্ধ্যে নেমে আসে একটু একটু করে। অন্ধকার বুনো গাছের মত ডালপালা ছড়িয়ে উরুক্রম মঠের উপর এসে পড়ে। এবার ঘুম আসে দু'চোখ ভ'রে। ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে মহাশ্মশানের ওপার থেকে। রাম চোখ বন্ধ করে দালানটায় শুয়ে থাকে। সাধু এসে বলে, এই ব্যাটা উঠে পড়, সন্ধ্যো হয়ে গেছে, মঠে পুজো শুরু হবে।

রামসেবক বিরক্তি ভ'রে জবাব দেয়, না, তোমার অসুবিধে করব না; এখনই তো কাজে যেতে হবে।

রামসেবক উঠে পড়ে, ওর পা-দুটো টলছে। কিছু ভাল লাগে না। একবার মনে করে জবার কাছে যায়, তারপরেই নিজের প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে; জবার কাছে যাবে না ও। চোলাই খাবে না।

রামসেবক নেড়া পুলটার উপর এসে দাঁড়ায়। রাজ্যের গাড়ি চলেছে এ-পথ বেয়ে। ছেলে-মেয়ে-যৌবন-আলো—সব মিলিয়ে কোলকাতা। রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণের মিছিল দেখে। হতাশায় ভেঙে পড়ে ও। কি নিয়ে বাঁচবে রাম। ওর যে কিছুই নেই। এই পৃথিবীর আলো-প্রাণ সব থেকেই বঞ্চিত ও। এ-জীবনটা কাটছে শুধু মড়ার পাহাড় ঠেলে: জীবনের স্বপ্ন দেখা শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল। রাম পুরানো কাঠের পুলটার নীচে নেমে আসে। দু'গ্লাস খেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মনটা পড়ে থাকে জবার নীরব ভালবাসার মাঝে। জবা এখন কি করছে কে জানে। হয়ত প্রতীক্ষা করে

আছে ওর জন্যে। জবার ছোঁয়া লাগান গ্লাসটা হাতে না এলে নেশা জমে না কিছুতেই। রাম পায়ে পায়ে শ্মশানের অন্দর-মহলে ঢুকে পড়ে।

একটা বড় লোকের মড়া এসেছে—নতুন খাটে ক'রে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে বেশ। রজনীগন্ধার গন্ধে আদি গঙ্গার পচা জলের দুর্গন্ধ সরে গেছে ক্ষণিকের জন্যে।

রামকে দেখে ডাক্তার বলে, ভাল করে চুলি সাজা রাম: জজ-সাহেবের মড়া। বক্‌শিশ ভালই পাবি।

শববাহকদের কয়েকজনকে দেখেই রাম বুঝে নিয়েছে এরা ভদ্র-লোক; বকশিশের মোহ ওর নেই। ভদ্রলোক দেখলেই চিনতে পারে ও; ভক্তি হয়। এদের প্রতি রামের মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মে যায়। এরা সত্যিকার ভদ্রলোক—অন্যায় খুব একটা করেনি জীবনে। চেহারায় চোখে মুখে একটা মিষ্টি মিষ্টি ছাপ: ছাপটা সব মানুষের নজরে পড়ে না। রাম একটুখানি দাঁড়িয়ে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এর পর কাঠ এনে যত্ন করে চুলি সাজিয়ে দিল।

বামুন মন্ত্র উচ্চারণ করল ভক্তি ভ'রে।

মড়ার মুখে আগুন দেয়—জজ সাহেবের বড় ছেলে: প্রৌঢ়, মাথার অর্ধেকের বেশী চুল সাদা হয়ে গেছে।

চিতার আগুন জ্বলে উঠে। প্রৌঢ় কয়েকজন এসে বসে শান-বাঁধান চাতালটায়। রাম ভক্তিভরে ওদের দেখে।

ওদেরই একজন বলে, মায়ের জ্ঞান ফেরেনি। কি-যে হল; বরুণকে রেখে এলাম। ডাক্তার বাবু বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই।'

আর একজন বললে, মাকে আর বাঁচান যাবে না, খুব শক্‌ পেয়েছে।

রাম আদি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে। এখানে এলেই জবার কথা মনে পড়ে যায়। জবা এসেছিল একদিন, আজ যায়নি ও। জবা যদি আসে ভাল হয়। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তো কাজ মিটে

যাবে; তার পর সারারাত অখণ্ড অবসর। ইলেকট্রিক-চুলি চালু হয়ে গেছে। ওখানে মড়ার লাইন। এখানে মড়া কম আসে। কে আর কষ্ট করতে চায়, এ-দুনিয়ায়। বিজ্ঞানের যুগ। মরেও শান্তি।

'বল হরি হরি বোল'।—আবার মড়া এসেছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাম প্রাচীরের ফোকর দিয়ে মহাশ্মশানের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে।

শববাহকের দল নতুন মড়াটাকে ঘিরে নীরবে চোখের জল ফেলছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যে একটু আগেই জজ সাহেবের মুখে আগুন দিয়েছে, সে চিৎকার করে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠে, মা তুমি বিধবা হতে পার না! মা! তুমি যে আমাদের মা!

পনরো

জবা সারারাত চোলাই-এর কলসীর পাশে বসে থাকে। যদি সে আসে! রামসেবক এলো না।

জবার বাবা বার বার জবাকে শুয়ে পড়তে বলেছে, জবা কোনও জবাব না দিয়ে কলসীর পাশে বসে আছে; সে আজ এলো না! জবার ভাবনা বেড়ে যায়; লোকটা কেমন রইল কে জানে! এমন তো কখনও হয় না। এদিকে এতক্ষণ সহস্র কলরবের পরে পল্লীটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলছে, শালীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। চল শালা, এখানে আর কখনও আসব না।

লোকটা চলে গেছে। আবার স্তব্ধতা নেমে আসে।

টগরের ছেলেটাকে পুলিস মর্গে নিয়ে গেছে। টগর সেই যে দরজার খিল দিয়েছে, আর খোলেনি। পাশের ঘরের জ্যোৎস্না বেড়ার ফাঁক থেকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখছে টগরকে। টগর মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে।

জবা ভাবে, একবার শ্মশানে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু ওর বাবা যে বাড়ী আছে। কাল একবার সাধুর আশ্রমে গিয়ে দেখে আসবে জবা। আর কতটুকুই-বা। রাত তো শেষ হতে চলল। জবার বাবা ঘুমুচ্ছে। খোলা জানালাটার কাছে মুখ রেখে জবা বসে আছে অন্ধকারে কলসীটার পাশে।

একটু একটু করে কালো আকাশ সাদা হয়ে আসছে। বন্ধ-দরজার পাশের অন্ধকারটা ফিকে হয়ে গেল। পাশের গলির মোড়ের বুড়ো বটগাছটার ডালপালায় পাখীরা জেগে উঠেছে। ওদের হাঁক-ডাক জবার ঘর থেকেই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়ার আওয়াজ। একটা রিকসা চলেছে ঠুং ঠুং শব্দ করে। বড় রাস্তার ঘুম ভাঙ্গলেও এপাড়ার ঘুম ভাঙ্গেনি এখনও। এখানে রাত হয় রাত করে, ভোর হয় বেলা করে। জবার বাবা ঘুমুচ্ছে পাশের খোলা জানালার পাশে।

জবা দরজা খুলে বাইরের প্রকৃতিকে দু-চোখ ভ'রে দেখে নেয়। রাম সত্যিই এলো না। ও কেমন রইল কে জানে!

জবা ওর বাবাকে ডেকে দিয়ে উনানে ঘুঁটে দেয়। চৌকাঠে জলের ছিটে দিয়ে এসে চোলাই-এর কলসীটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়।

ষোল

বাজারের থলি হাতে রাম উরুক্রম মঠের বাঁশের বেড়াটা পেরিয়ে গলির মোড়ে এসে দেখে—জবা আসছে এদিকে।

রাম থমকে দাঁড়ায়।

জবার মুখটায় কালি পড়ে গেছে। একটা বিষণ্ণতা সারা মুখে ছড়ান। ভাবনার ছাপ চোখের তারায়।

জবা কাছে এসেছে।

রাম প্রশ্ন করে, জবা তুই? তোর বাবা বাসায় নেই?

তুমি কাল যাওনি কেন? জবা উদ্‌গ্রীব হয়ে পাল্টা প্রশ্ন তোলে।

রামসেবক জবাব দেয়, এমনই, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না; তা ছাড়া ভাবলাম আর চুল্লু খাব না।

জবার ছল ছল চোখ দুটোয় হাসির ঝিলিক। সত্যি বলছ খাবে না? আজ কি-যে আনন্দ হচ্ছে!

না রে পারিনি। ওই কাঠের পুলটার নীচে গিয়ে খেয়ে এসেছি।

জবা আবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। চোখ দুটো জলে ভারী হয়ে আসে। বলে, চল ভেতরে যাই।

নারে! সাধু আছে, কি ভাববে।

জবা থমকে দাঁড়ায়। বলে, চল তোমার সঙ্গে বাজারের দিকে যাই।

তোর বাবা যদি দেখে ফেলে!

দেখলই বা!

কিছু বলবে না তো?

বলবে বৈকি! মারবে। ঘরে বন্দী করে রাখবে। আর চোলাই বেচতে দেবে না।

তবে কি দরকার? তুই চলে যা, আমি সন্ধ্যের সময় যাব, আজ একটু বেশীক্ষণ বসে থাকবো; মধুকে বলে দেব, ও সামাল দিয়ে নেবে।

জবা আর রাম বড় রাস্তায় নেমে এলো।

পথ চলতি রাম বললে, জবা তুই সেদিন এসেছিলি, সন্ধ্যেটা ভাল কাটল। যতদিন বেঁচে থাকবো ওই সন্ধ্যে-রাত্তিরটা মনের আলমারীতে জমা করে রাখব। হাঁ রে জবা, আবার একদিন এমনি করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আয় না, দুজনে আদিগঙ্গার ঘাটে বসে অনেক না-বলা কথা বলব, যেগুলো জমা হয়ে আছে অনেকদিন ধরে। হাঁ রে জবা, সত্যি করে বলতো, তুই বিয়ে করবি কি-না।

বর জুটছে না যে, চুল্লুউলীকে কে বিয়ে করবে বল? তুমি ওই কাজটা ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি।

কাজ ছেড়ে দিলে খাব কি?

জবা চুপ করে যায়; পায়ে পায়ে ওরা কংক্রিটের সাঁকোটা পার

হয়ে আসে। এবার জবা তাড়াতাড়ি পা ফেলে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে যায়।

রাম প্রতিদিনের মত থলি হাতে উদ্বাস্তু বাজারে ঢুকে পড়ে। যা হয় কিছু থলিতে পুরে নিয়ে আবার মঠের দিকে পা বাড়ায়। আজ জবাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কাল সারারাত হয়ত ঘুমোয়নি জবা। বেচারা! আজ ও যাবেই। জবার হাতের ছোঁয়া লাগান চোলাই না খেলে নেশা জমে না। জবা বলেছে, 'এই কাজটা ছেড়ে দাও।' কাজ ছেড়ে দিলে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে? আর জবাকে নিয়ে ঘর-বাঁধাও হবে না ওর। রাম আবার নেড়া পুলটা পেরিয়ে এপারে এলো, আকাশের দিকে তাকিয়ে সময়টা ঠাওর করার চেষ্টা করল, কুচ্‌কুচে নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্যটা টেরচা ভাবে আলো ছড়াচ্ছে। একটু পরেই ওটা মাথার মধ্যিখানে আসবে। তখন আর এখানে পা পাতা যাবে না। রাম তাড়াতাড়ি পা ফেলে মঠের দিকে এগিয়ে গেল। চায়ের দোকানী রামকে ডেকে বললে, কি-রে, আর আমার দোকান থেকে চা নিস্‌না কেন?

রাম মিথ্যে করে বলে, তোমার দোকানের চা-টা ভাল নয়; সাধু পছন্দ করে না।

তোর সাধু চিরকালই আমার হাতের চা খেয়ে ভাল বলেছে; আজ পছন্দ করে না! দোকানদার খেঁকিয়ে উঠে।

এই গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কথা বাড়াতে চাইল না রাম; ও দোকানটা পেরিয়ে মঠের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সাধু প্রশ্ন করে, এত দেরী করলি কেন?

রাম সাধুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাজারটা দালানে ঢেলে, জল এনে আনাচ ধুতে বসে।

রোদ্দুরটা টাটিয়ে উঠেছে।

সাধু বললে, এবার গরমটা জাঁকিয়ে পড়বে, আকাশে মেঘের দেখা নেই।

সতেরো

সূর্যের তাপ বাড়ল, এদিকে সাধুর উনুনে আগুন জ্বলে উঠল।

মধ্যাহ্নভোজের পালা শেষ করে উরুক্রম মঠের চাতালে ভিজে গামছা পেতে রামসেবক শুয়ে পড়ল দিবা নিদ্রার আশায়। শুয়ে রইল শু. ঘুম এলো না দুচোখ ভ'রে। সময়টাও চলেছে সাবেকী আমলের স্টিম্-ইঞ্জিনের মত ধিক ধিক করে। গরমটাও পড়েছে বেশ। ঘামে ভিজে উঠেছে শুকিয়ে যাওয়া ভিজে গামছাটা। সাধু ঘরের ভেতরে কাতরাচ্ছে. উঃ কি গরম! রাম বাইরের চাতালে। জবার শুকনো মুখটা বার বার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ওকে ভোলা যায় না। চেষ্টা করেও রাম ভুলতে পারে না জবাকে। জবা রামের সারা বুকটা জুড়ে আছে; এতটা বয়স হল, জীবনে ঐ জবার মত একটা মিষ্টি মেয়ের সন্ধান পেল না। জবা সত্যিই ওকে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে কোনও ভেজাল নেই। মেয়েটা বড় সরল। ওর চোখ দুটোয় সরলতা মাখান। একদিন না দেখতে পেয়ে ও ছুটে এসেছে রামের কাছে। হয়ত সারারাত ঘুমোয়নি জবা। রাম মনে মনে বলে, দুঃখ করিসনি জবা, একদিন না গিয়ে চেষ্টা করছিলাম, তোকে ছেড়ে, না দেখে থাকতে পারব কি-না দেখতে। দেখলাম না, তোকে ছেড়ে আমি সত্যিই একা। আমার আর কেউ নেই রে। আজ আমি সত্যিই একা। তোকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাই। কিন্তু চাকরি ছেড়ে আর তো কোথাও কিছু জুটবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, যে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার, সেখানে বেকারের দল ভারী করাটা কি ঠিক হবে। আমি তবুও একটা কাজ পেয়েছি, অনেকে যে সেটুকুও পায়নি। আমার পরিবর্তে যদি অন্য লোক কারখানা কিংবা অফিসে কোনও একটা চাকরি পায়, তবে হয়ত তার মাকে মরতে হবে না খিদের জ্বালায়। যাকগে, ওসব ফালতু ভাবনা ভেবে লাভ নেই। শালা যা গরম পড়েছে, ঘুম আসবে কি করে? চাতালটা তেতে আগুন হয়ে

আছে। জবা! তোকে ভোলা যায় না, ভুলব না কোনও দিন। তোকে বুকের মধ্যে করে রাখব চিরকাল। দুঃখ করিসনি জবা, আজ যাবই, না গিয়ে উপায় নেই; তোর ছোঁয়া-লাগানো গ্লাসে চোলাই না খেলে আমার নেশা হয় না।

বিকেল গড়িয়ে এলো একটু একটু করে।

রাম কালীঘাটের হর্কাসকর্ণার থেকে কিনে আনা লংক্লথের পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে রাস্তায় নেমে আসে। নেড়া পুলটা জবাদের বাসার দিকে এগিয়ে গেছে। আজ একটু সকাল সকাল এসে পড়েছে রাম। এখনও নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দারা ল্যামপোষ্টের গা ঘেঁসে লাইন করে দাঁড়ায়নি খদ্দেরের প্রতীক্ষায়। রাম চলেছে জবার কাছে। দরজাটা খোলাই ছিল, জবা আছে ভেতরে, তখনও চোলাইএর কলসী এ-ঘরে আসেনি। রাম ডাকল, জবা।

একটু বস, আসছি। জবা অন্দর-মহল থেকে জবাব দিল।

জবার কথাটা কত মিষ্টি। মিষ্টি ওর হাসি; চক্‌চকে চোখদুটো ওকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে; রাম স্থির থাকতে পারে না। ও আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে বসে থাকে, জবাকে দেখার আশায়। এখন খদ্দের নেই ঘরে, জবা তো একটু এলে পারত। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা যেত।

জবা এলো এ-ঘরে আরও খানিক পরে। জবাকে এবেলা খুব সুন্দরী দেখাচ্ছে। জবা নিজে থেকেই বলে, বাবা বাড়ী নেই; গেছে রাসবিহারী মোড়ে দোকান দিতে।

এ-কথা রামের অজানা নয়, ও জুত করে বসে একটা পিঁড়িতে।

জবা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এক গ্লাস চোলাই দেয় রামের হাতে। ও যেন একটু অমৃতের সন্ধান পায় অনেকক্ষণ পরে। রাম খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিল জবার দিকে। জবা আর এক গ্লাস দিল রামের হাতে। আঙ্গুলে আঙ্গুলে ছোঁয়া লাগল, কথা হল আঙ্গুলে আঙ্গুলে—চোখে চোখে।

রাম শেষ বারের চোলাইটা তারিয়ে তারিয়ে খেল।

জবা দেখছে রামকে। ওর চোখের পলক পড়ছে না।

রাম দেখছে জবার সুঠাম দেহের বাঁধুনি।

দরজার বাইরে বেশ্যাদের মিছিল চলেছে লাইট-পোস্টটার ধারে দাঁড়ানোর তাগিদে—প্রাণের তাগিদে।

রাম চেয়ে আছে জবার কাজল মাখান চোখের দিকে। ওর ডাগর চোখদুটোয় আকুল করা আহ্বান। কি বলতে চায় ও, রাম বোঝে, তবুও জবার প্রশ্নের জবাব কেমন করে দিতে হয়, জানে না ও।

দু-জন খদ্দের এসেছে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে।

রামের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল; ও সবে জুত করে বসেছিল জবার মুখোমুখি—দুটো মন-প্রাণের কথা বলার আগেই দু-জন জোয়ান-ছেলে ঢুকে পড়ল দরজা পেরিয়ে।

জবা সাত তাড়াতাড়ি গ্লাস ভর্তি করে চোলাই ওদের দিকে এগিয়ে দিল। ও মনে মনে কামনা করল, 'হে ঈশ্বর ওরা যেন দু-গ্লাস গলায় ঢেলে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়।' কিন্তু হায় মোটেই বিদায় নেওয়ার পাত্র ওরা নয়, রামের দ্বিতীয় গ্লাসটার মত তারিয়ে তারিয়ে খেতে শুরু করল দুজনে; মনের কথা পাড়ল মেঝেতে বসে; ওদের একজন মাঝে মাঝে জবাকে দেখছে,—দেখছে ওর ভরা যৌবন, নিটোল শরীর।

জবা আজ সেজেছে বেশ। খোঁপা বেঁধেছে উঁচু করে, বেলফুলের মালা জড়িয়েছে খোঁপায়; ঢাকাই কাজ করা একটা নতুন শাড়ী পরেছে ও। হাঁটু গেড়ে বসেছিল জবা; ওদের একজনের চোখে চোখ পড়তেই বুকের কাপড়টা টেনে দিল পিঠ পর্যন্ত।

রাম বসে রইল অনেকক্ষণ—বাধ্য হয়েই ওরা আরও দু-গ্লাস চোলাই খেয়ে উঠে পড়ল; ওদের মনে এখন রঙ ধরেছে; পা টলছে; দু-জনে চলেছে নিষিদ্ধ-পল্লীর গলি ধরে মনের মানুষ খুঁজতে।

রাম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বললে, চোলাই বিক্রি বন্ধ কর জবা। একাজে তোকে মানায় না।

জবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেয়, একমাত্র তুমিই পার এ-নরক থেকে আমায় উদ্ধার করতে।

কিন্তু তুই যে বলেছিস, 'এ-কাজটা ছেড়ে দাও।' কিন্তু আর একটা পাব কোথা? দেখলি না একটা কাজ জোগাড় করতে না পেরে টগরের ছেলেটা গলায় দড়ি দিল। তুই যতই বল, পেট যে মানবে না, আজ তুই চোলাই বেচছিস, তোর বাপ দোকান দিয়েছে—রাসবিহারীর মোড়ে, যা হোক করে তোদের চলে যাচ্ছে।

জবা বলে, তবুও ওই কাজটা আমার ভাল লাগে না। শ্মশানে গেলেই মন খারাপ হয়ে যায়। কোন কাজে মন বসে না। ভাবি এই তো পরিণতি; কিবা হবে বেঁচে থেকে। তবুও যদি বে-থা করে সংসার বাঁধতুম, ছেলে-মেয়ের মধ্যে বেঁচে থাকাটা সার্থক হত। এ-জীবন আর ভাল লাগে না, তবু বাপ বেঁচে আছে; চোখে চোখে রাখে, তা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে হত। কিন্তু এখানে যে একটুও শান্তি নেই, সব খুইয়েও দু'বেলা ভাত জোটে না। সমাজে ঠাঁই নেই। বিয়েওয়ালা মেয়েগুলো মায়ের বাড়ী যায়, স্বামীর হাত ধরে; ওদের দেখে মুচকি হাসে, এ অপমান ওদের সহ্য করতে হয়; হায়! ওই বিয়েওয়ালা মেয়েগুলো তো জানে না, ওদের অনেক স্বামীও লুকিয়ে অন্ধকারে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওদের অনেকেরই বাঁধা মেয়েমানুষ আছে; বৌগুলো সে খবর রাখে না; তাই এরাও মুচকি হাসে ওদের দেখে।

রামসেবক হাতটা বাড়িয়ে দেয় জবার দিকে।

জবা উঠে গিয়ে দরজার বাইরেটা একবার দেখে নেয়।

রাম জবার হাতটা টেনে নেয় বুকের কাছে।

রামের বুকের দপ্‌দপানি শুরু হয়ে যায়। ওর হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত তাল-গোল পাকায়।

হঠাৎ মধু এসে হাজির হয় ওখানে, বলে, যা এবার সামাল দে; আমি অনেক ম্যানেজ করেছি; ডাক্তারবাবু তোকে খুঁজছে।

রাম জবার হাতটা সরিয়ে দেয়।

জবা কলসীর পাশে বসে মধুর জন্যে চোলাই ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মধু হাসে। ওর হাসিটা বড় মিষ্টি।

জবা মধুকে গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

রাম আর এক গ্লাস চুল্লু চায় জবার কাছে। জবা বলে, না, তুমি কাজে যাও; আর খেতে হবে না।

রাম উঠে পড়ে। কাজে যেতে মন চায় না। তবুও যেতে হয়। বুকের ভেতরের দপ্‌দপানি এখনও থামেনি। মধুটার বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে; আর সময় পেল না; আর মিনিট কয়েক সময়ও বাইরে কাটিয়ে আসতে পারল না; হঠাৎ এসে হাজির। জবা কি ভাবল কে জানে!

বেশ্যাদের ভীড় ঠেলে রাম বড় রাস্তায় নেমে আসে। এখানে আলোর রোশনাই। মানুষ চলেছে তীর্থক্ষেত্রে পুণ্য অর্জন করতে। দোকানীরা পসার সাজিয়েছে দু-পয়সা রোজগার করার আশায়। রাম এগিয়ে যায় দক্ষিণে। এখানে ঠেলা, লরী, টেম্পো আর মানুষের জট বেঁধেছে। জট খুলতে সময় লাগবে অনেক। ফেরীওয়ালারা মানুষকে—গাড়ীকে পথ করে দিতে রাজী নয়। চওড়া রাস্তাটা এখানে সরু হয়ে গেছে অনেকখানি। কেউ দেখার নেই এসব। সবাই চলেছে আপন খেয়ালে।

রাম ফুটপাথ ধরে সাজান ফুলের পসরা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যায় মহাশ্মশানের দিকে।

আঠারো

আগুন-মড়া-কাঠ এই তিনটি নিয়ে রামের সংসার। মাঝে জবা এসে সব ওলোটপালট করে দেয়। জবা না থাকলে রামের বাঁচাটাই বুঝি হয়ে উঠতো না। ঝুলে যাওয়া লাসটাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে দিতে দিতে রাম এ সব ভাবে। দিনের গরম রাতটাকে গ্রাস করতে চাইছে। একটু হাওয়া নেই; আদিগঙ্গায় জল নেই; আকাশে মেঘ নেই; চোত-বোশেখ মাসটাকে রাম কোন দিনই সহ্য করতে পারে না।

মড়া ঠেলে ঠেলে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবুও রক্ষে এটাই শেষ। এর পর হয়ত একটু বিরতি মিলতে পারে। রাম ঘাটে গিয়ে বসে। না সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। পোড়া ছাই মাথার মধ্যে জমা হয়ে আছে। পিঠটা ঘামাচিতে ভরে গেছে। হায়, এখন যদি জবা আসত, ঘেন্নায় দূরে সরে বসত। একটু বসে জিরিয়ে নেয় রাম; তারপর গঙ্গার ঘাটে ফেলে দেওয়া একটা কলসী তুলে নিয়ে আসে। টিউবওয়েলটা পাম্প করে জোরে জোরে, কলসীটা ভর্ত্তি হয়ে উঠে। ফুটো কলসীর সব জল বাইরে পড়ার আগেই ও মাথায় ঢেলে নিয়ে একটু স্বস্তি ফিরে পায়। কাপড়ের খোঁট দিয়ে মাথাটা ঘষে নিয়ে ঘাটের চাতালটায় এসে বসে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। একটু একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে এখন। রাতটা গড়িয়ে চলেছে ঢিমেতালে। জংলী গাছের মাথাটা নড়ে চড়ে উঠছে। পাখিদের হাঁকডাক শুরু হয়ে যায়; জ্যোৎস্না রাত; গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ওরা শক্ত হয়ে বসে। [illegible]ের ঘুম আসে দু চোখ বেয়ে। ও জুত করে ঘাটের চাতালে শু[illegible], এমন সময়ে হঠাৎ মধুকে দেখে চমকে উঠে; বলে, তুই!

গরমে ঘুম এলো না। [illegible] বসে সময় কাটে না, তাই দেখতে এলুম তুই কি করছিস!

কি আর করব বল; মাথায় একটু জল ঢেলে শোয়ার ব্যবস্থা করছি; আয়, বস।

মধু রামের পাশে বসে; ওর মুখ দিয়ে পচাই-এর গন্ধ বেরোয়।

রাম বলে, তুই কি এখন বাংলা খেয়ে এলি?

হ্যাঁরে, চেতলার হাঁট থেকে। মনটা ভাল নেই। সারারাত শুধু জোনকীর কথা ভেবেছি। বেচারী!

তুই ওকে বিয়ে করলি না কেন?

তার আগেই, সব শেষ।

তুই একথা তো কোনও দিন বলিসনি।

বলার সময় পাই কোথায়! মড়া ঠেলি, চুল্লু খাই, দিন যায়।

কথা বলে সময় নষ্ট তো করতে পারি না। তুই জবাকে বিয়ে কর রাম। মেয়েটা বড় ভাল।

তুই হঠাৎ জবার কথা বলছিস কেন বলতো?

বলছি এজন্যে যে, আমি আজও জোনাকীকে ভুলতে পারিনি। নদীয়া জেলার তেহট্ট থানায় জলঙ্গী নদীর পাড়ে আমরা থাকতুম। ছেলেবেলায় জোনাকীর বাবা-মা মরে যায়। খুব দুঃখের মধ্য দিয়ে জোনাকীর দিন কাটতো; কোন দিন খাওয়া জুটতো, কোন দিন জুটতো না। জঙ্গল থেকে কাঠ কুটো কেটে এনে বেচত। একদিন এমনি এক চৈতের দুপুরে ও জলঙ্গী নদীতে মাছ ধরতে নামে; ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। পথে মানুষজনের চিহ্ন নেই। বাস থেকে নেমে বাসায় যাব বলে জলঙ্গী নদীর বাঁধ ধরে হাঁটছি, হঠাৎ জোনাকীকে চোখে পড়ল। বুকটা উদোম খোলা। শরীরে মসৃণ ঢল নেমেছে। ভেজা শাড়ীটা পেটের উপর জড়ান। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত বুক ডুবিয়ে ও মাছ ধরছে আপন মনে, আবার উঁচু হয়ে মাছগুলো রাখছে কোমরে জড়ান শাড়ীর আঁচলে। হঠাৎ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলঙ্গীতে তখন তেমন জল ছিল না; ভাঁটার টান। আমি জলের কাছে নেমে এসে ওকে প্রশ্ন করলুম, জোনাকী তোর খাওয়া হয়েছে?

ও কোনও জবাব দিল না, লজ্জায় মাথা নীচু করে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, আমার সঙ্গে বাসায় আয়।

জোনাকী ভিজে কাপড়টা বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমার পেছু পেছু বসায় এলো। তখন আমার শরীরে রক্ত টগ্‌বগিয়ে উঠেছে। জোনাকী ঘরে আসতেই আমি ওকে বুকে টেনে নিলুম। ও প্রথমে বাধা দিল, তারপর শিথিল হয়ে পড়ল ওর হাত দুটো। আমাকে ও মেনে নিল। জোনাকী অবশ হয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা ঠোঙ্গায় মুড়ি এনে ওকে দিলুম। ও ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে পথে নেমে এলো।

তারপর?

তারপর ওর নীচ পেটটা একটু একটু করে ভারী হয়ে উঠল। বোঁটায় কেমন যেন একটু কালো রঙের ছোপ।

তারপর একদিন সারারাত বৃষ্টি হল অঝোরে। মেঘ ডাকার শব্দে ঘুম এলো না কিছুতেই। সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। জলঙ্গী নদীতে জোনাকীর লাশ ভাসতে দেখে জামাই এসে খবর দিল। জামাই ঘটনাটা জানতো। সেদিন নদীতে জোয়ার এসেছিল; নদীও ছিল জোনাকীর মতন ভরা যৌবনে ভরা।

আমি গাঁ ছেড়ে ফেরার হলুম; তারপর থেকে এখানে। তুই জবাকে বিয়ে কর রাম।

রাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

উনিশ

মধু পা-টেনে টেনে চলে গেল। রাম বসে রইল আদি গঙ্গার পাড়ে। রামের ডাক পড়েছে। রাম এলো শ্মশানের চৌহদ্দির মধ্যে। ডোমেদের মড়া এসেছে। ফুল দিয়ে সাজিয়েছে খাটিয়াটাকে। একটা ছেলের মড়া। ওর বাপ বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে খাটিয়ার পাশে। বুড়ীমা কাঁদছে হাপুস নয়নে। ডাক্তার এসে দাঁড়িয়েছে খাটিয়ার পাশে। খানিক মৌন থেকে ডাক্তার বললে, রাম চুলি সাজা; এখানে আর কাজ করতে মন চায় না রে!

রাম ডাক্তারের মুখে এমন কথা শোনেনি কখনও। ওর মতে ডাক্তারটা একটা পাথর, রক্ত-মাংস বলতে ওর শরীরে কিছুই নেই; কখনও মড়া দেখে দুঃখ পায় না।

রাম ডাক্তারের মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে থাকে।

ডাক্তার বলে, তোরই জাতভাই; আবার পয়সা চেয়ে বসিস্‌নি যেন।

রাম ধাক্কা খায়। কথা বলে না।

ডাক্তার বিড় বিড় করে বলে চলে, হায়রে আমাদের দেশ, তের-

চোদ্দ বছরের ছেলে, বাপের সঙ্গে কাজ করত ; কর্পোরেশনের 'পিট-বয়' ; ড্রেনের ময়লা তোলে। ওর বাপটাকে দেখ. মোষের মত চেহারা ; ছেলের পয়সায় চোলাই গিলে চেহারাটা করেছে দেখ ; বেটা বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, সাতটা বাঘেও ওকে খেতে পারবে না।

ডাক্তার চোখ মুছলো।

রাম আবার অবাক হ'য়ে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতদিন চাকরি হল, ডাক্তারকে কখনও কাঁদতে দেখেনি রাম !

রাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

টগরের ছেলেটার কথা মনে পড়ল রামের ; বললে, মরার জন্যেই তো জন্মেছে এরা। এদের মাথায় পা রেখেই নেতারা গাড়ী চড়ে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে রাজত্ব চালায়।

ডাক্তার আর কথা বাড়ায় না। রাজনীতিতে ওর ঘেন্না ধরে গেছে। সেদিন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্লমার্কসের স্মৃতি সভায় রাজ্যের তাত্বিক নেতারা এক সঙ্গে জুটেছিল, আর সেদিনই ধাপায় ময়লার মধ্যে থেকে কয়লা কুড়ুতে গিয়ে এদেশের সাতটা জীবনের জীবন্ত সমাধি ঘটল। হায়রে রাজনীতি ! রাজনীতির গন্ধ পেলেই ও সেখান থেকে সরে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা ! হায় ! আর এরই জন্যে কি ও জেল খেটে ছিল সাত বছর !

ডাক্তার তার দপ্তরে ফিরে গেল।

রাম কাঠ আনতে যায় মাথা নীচু করে।

ছেলেটার বাপ পড়ে আছে খাটিয়ার পায়া ধরে।

রাম কাঠ এনে চুলি ধরিয়ে দেয়।

পুরোহিত মন্ত্র পড়ে।

ছেলেটার বাপকে ছেলেটার বন্ধুরা ধরে নিয়ে চাতালে শুইয়ে দেয়।

আগুন জ্বলে উঠে যথারীতি।

রাম প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে।

আবার মৃদু-গুঞ্জন কানে এসে বাজে ; 'বল—হরি হরি বোল্।'

না, আজকের রাতটা শান্তিতে কাটল না। রাম গা ঝাড়া দিয়ে

উঠে দাঁড়ায়। জবাকে ভাবনার সময় নেই ওর, আবার ফিরে আসে শ্মশানে।

এক বিধবা স্বর্গে গেছে; ছেলেটা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'ডেথ্-সার্টিফিকেট' নিয়ে একজন গেল ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার এসে একবার নিয়মমাফিক দেখে ডোমকে কাঠ আনতে হুকুম দিলে।

রাম আবার কাঠ আনতে গেল।

পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করল পুরানো পদ্ধতিতে।

ছেলে মুখে আগুন দিয়ে ঘাটে এসে বসল।

আগুন তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে এই মরদেহটাকে দাহ করতে শুরু করল।

রাম এবারেও তার প্রাথমিক কাজ কর্ম সেরে ঘাটে এসে বসেছে। ঘুমে ওর চোখ দুটো বন্ধ হতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই; একটু যে শোবে, তারও উপায় নেই। বুড়ীর ছেলেটা বসে আছে রামের শোয়ার জায়গায়। পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওর বন্ধুরা। রাম বসে আছে ঘোলাটে অন্ধকারে ছেলেটার পাশে। ও বসে বসে দেখছে ওদের। এ-দৃশ্য ওর কাছে নতুন কিছুই নয়। মনে রেখাপাত করার মত মোটেই নয়। এই তো জগৎ-সংসারের নিয়ম। এখানে এলে একদিন যেতেই হয়; কেউই স্থায়ী নয়; যে যত বড় পণ্ডিতই হোক, আর দেশ নেতাই হোক। যেতেই হবে —যাওয়ার জন্যে যেন এ-পৃথিবীতে আসা।

রাম বসে বসে এই সব সাত পাঁচ ভাবে। মাঝে মাঝে ভাবনার স্রোত অন্য খাতে বহে যায়। জবা এখন কি করছে কে জানে। সেই বুড়োটাকে তার ছেলে চোলাই খাওয়াতে নিয়ে এসেছে কি-না কে জানে। টগর এখন কি-করছে, কে জানে! টগরের ছেলেটাকে এখনও পুলিস ছাড়েনি; মড়াটা হয়ত পচে ঢোল হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ টগরের ছেলেটাকে ওর বন্ধুরা নিয়ে আসবে এই মহাশ্মশানে। আনতেই হবে। এই তো নিয়ম। ভগবানের এই নিয়মের কোনও

ব্যতিক্রম নেই। মাটির নীচে কাউকে খাবে পোকায়, কেউ পুড়ে হবে ছাই। যা বেঁধে দিলেন তিনি. তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই কারুর।

রাম উঠে দাঁড়িয়েছে। একবার চুলিটা দেখা দরকার। হঠাৎ কয়েকটা কথা কানে এসে বাজে। ও চমকে উঠে। কান খাড়া করে শোনে। ছেলেটা বলছে, মানস, এ-পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না রে; আমি কি নিয়ে বাঁচব! মা গো মা, তুমি এ কি করলে, আমি কি নিয়ে থাকব? আমায় ফেলে চলে গেলে কেন?

মানস ওর বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, মা কি কারুর চিরকাল থাকে, কাঁদিস নি, তোর মাকে শান্তিতে থাকতে দে। এই তো আমার মা নেই, আমি কি তোর মত ভেঙ্গে পড়েছি।

আমার যে আর কেউ রইল না রে।

কেন, তোর ছেলে তোর বৌ সবাই তো রইল।

কেউ আমার নয় রে মানস, কেউ আমার নয়; ছেলেটাও আমার নয়।

কি যা তা বলছিস? মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ!

মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে রে। আমার আর কেউ রইল না।

কেন? বৌ-ছেলে।

ওরাও আমার নয় রে, বৌ শুধু অভিনয় করে, ভালবাসে না, ছেলেটা ভাগ্নের। আমি নামেই বাবা।

তুই একটু চুপ করবি অলোক।

একেবারেই চুপ করতে পারলে ভাল হত; আর বাঁচতে সাধ নেই। মা চলে গেল। আমার আপনজন বলে আর কেউ রইল না। আমিও অভিনয় করি; পাড়ার পাঁচজন জানতে পারবে তাই। আমি বোবা হয়ে ছেলের বাবা সেজে সংসার করি। বাজার করি। তোদের সঙ্গে হেসে কথা বলি।

রাম বুড়ীর দেহটাকে খুঁচিয়ে চুলিটাকে ঠিক করার অছিলায় মহা-শ্মশানের অন্ত শববাহকদের পাশে এসে বসল। এখানেও স্তব্ধ রাত্রিতে

অলোকের কান্না কানে এসে বাজল—'আমার যে আর কেউ রইল না রে।'

মড়া পুড়ে গেল! জল ঢালা সাঙ্গ হল। সেদিন রাতটা ছিল পূর্ণিমার। রাম পা টেনে টেনে নেড়া পুলটার উপর উঠে এলো। এখানে আলোর মিছিল। অন্ধকার হলে ভাল হত। ভাল করে চাঁদের আলোয় চান করা যেত। কিন্তু তার উপায় নেই, আলোর মিছিল পুলটার দু-পাশে। চাঁদ ঢেলে দিয়েছে আলোর ফোয়ারা; কিন্তু কোলকাতা শহরের পিচ ঢালা রাস্তা পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারছে না,—বিজলী আলোর ছটায়। রাম দু-চোখ ভরে দেখছে,—ভগবানের দেওয়া আলোর পাশাপাশি কর্পোরেশনের আলোর মেলা। ও স্থির হয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। চুলি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখনও। ও রোজই বেরোয়; এমন কিছু নতুন নয়; তবুও আজ ওর কাছে মনে হল নতুন; কারণটা আর কিছুই নয়; এবার নতুন করে সংসার পাততে হবে ছেলেটাকে; ওর মা নেই যে, ওর বৌটা বোধ হয় সুন্দরী। শাশুড়ী মরে গেল। লেটা চুকলো; এবার আরও সোহাগ পাবে ভাগ্নের; পথের কাঁটা বিদেয় হল। কর্তা তো অফিস যাবেই। না গেলে খাবে কি! একটা প্রবাদ শিখেছিল রাম ছেলেবেলায়; প্রবাদটা বলত ওর ঠাকুমা; দেশের কথা মনে পড়ে গেল। ঠাকুমা প্রায়ই বলত—

"শাশুড়ী মোল সকালে,—
খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে, কাঁদব আমি বিকেলে।"

মাকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটতো ঠাকুমা, সেই ঠাকুমাও একদিন চলে গেল। কিন্তু মায়ের কান্না আর থামে না; বিকেলের জন্যে কিন্তু বসে থাকে নি। সেদিন হাঁড়ি চড়েনি ওদের। মাকে ভুলিয়ে রাখা যায় নি কিছুতেই। আবার একটু একটু করে সবই সয়ে গেল। ঠাকুমার কথা ভুলে মা আবার সংসার পেতে বসল। এই তো সংসারের নিয়ম। ভগবানের তৈরী নিয়ম। বুড়ীর ছেলেটাও ভুলে যাবে ওর মাকে। ওর সুন্দরী বৌটা একদিন বুড়ী হবে। অথবা যৌবনেই পালিয়ে

যাবে ভাগ্নের সঙ্গে। তখনও কিন্তু ছেলেটা সংসার করবে। ভাগ্নের দেওয়া ছেলেটাকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে সব কিছু ভুলে।

রাম পায়ে পায়ে উরুক্রম মঠের দিকে এগিয়ে যায়। এখনও রাত বাকী। গলিটায় চাঁদের আলো পড়েছে—রাস্তার দোকানের টিনের চালের ফাঁক থেকে। মিষ্টি মাটির রাস্তায় মিষ্টি চাঁদের আলো। ঘুম আসছে দুচোখ ভ'রে।

কুড়ি

সকালের মিষ্টি রোদ ধীরে ধীরে রূপ পালটায়। এখন গনগনে আগুন। আদ্যিকালের চৌকো চৌকো পাথর বেছান গলিপথটা একটু একটু করে তাতিয়ে ওঠে। কুমোরদের মাটি এসেছে ঠেলায় করে; টেরা-বাঁকা পাথরের ফাঁকে চাকা যাচ্ছে আটকিয়ে। দুজন জোয়ান আদুড় গায়ে চাকা ঠেলছে প্রাণপাত করে! ঘাম ঝরছে অঝোরে। সদ্য সদ্য ওরা যেন চান করে এসেছে আদি গঙ্গার ঘোলাটে জলে। অবশ বেলায় জবা দরজার চৌকাঠের পেছনটায় একটা আধ-ভেজানো পাল্লায় হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। দু-চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর—আহা কত কষ্ট করছে ওরা দু-মুঠো অন্নের জন্যে। জবা দরদী মন নিয়ে ওদের দেখছে। ওদের একজনের চেহারার আদলটা ঠিক রামের মতন। রামও কত কষ্ট করছে, এই ভর দুপুরে। আগুনের সঙ্গে লড়াই। জবা এবার রামের কথা ভাবতে বসে; কেন যে ও এই কাজটা ঘাড়ে পেতে নিল। দুনিয়ার আর কি কোন কাজ থাকতে নেই। হয়ত নেই, এত লোক বাড়ছে, কত কারখানা বন্ধ হচ্ছে রোজ। কত লোক জন্মাচ্ছে—এত লোকের কাজের জন্যে কোনও ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হচ্ছে না। থাকগে ওসব, ভেবে ভেবে মন খারাপ করে কি হবে। হায়রে এখনও ঠেলাটাকে গলির শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে পারছে না ওরা। বেচারী!

বেলা গড়িয়ে আসছে একটু একটু করে।

জবার বাবা বেরুবার সময়ে জবাকে সাবধান করে গেল, সাবধানে থাকিস! আমি সময় মতই এসে পড়ব।

জবার বাবা ঠেলাটার গা ঘেঁসে রাস্তাটা পার হয়ে গেল।

জবা আবার অবশ-বেলায় ঠেলার কুলী দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে রামের কথা ভাবতে লাগল। রামের উপর রাগ হয় ওর। লোকটা এখন কি করছে কে জানে! এখন খদ্দের-পাত্তি নেই, গলিটা নির্জন, এখন তো একবার আসতে পারতো। হায়রে সন্ধ্যে ছাড়া অন্য সময় একদিনও রাম এলো না এখানে।

জবা চেয়ে আছে ঠেলাটার দিকে—ওর মন চলে গেছে অন্য প্রান্তে। রাম নামটায় একটা মোহ জড়ানো আছে। স্বামীর নাম নাকি করতে নেই, কিন্তু হায়রে ওই নামটাই সকাল-সন্ধ্যে জপমালা হয়েছে। জবা যখন ছোট ছিল কি ভালই না ছিল ও। ভাবনা চিন্তার বালাই ছিল না তখন। বাবার কাজে একটু সাহায্য করা, এই গলিটার মধ্যে খেলে বেড়ান, বাবার ধমক শোনা, এই ছিল কাজ। জবা ওর বাবার ধমকে কান দিত না একটুও, কারণ বাবার ধমক ওর খুব ভাল লাগত, বাবা যেন আদর করে ধমক দিচ্ছে ওকে। দুঃখ হয়, বাবা আর ওকে ধমক দেয় না। আজ আর ধমক দিলে জবা হয়ত সহ্য করতে পারত না।

ঠেলাটা চলতে শুরু করেছে। জয়ের আনন্দে হেসে উঠল ঠেলার কুলী দুটো।

গড়গড় করে চৌকো পাথরের উপর দিয়ে মাটির বোঝা নিয়ে ঠেলা চলল—আদিগঙ্গার পাড়ের দিকে। ওখানে ঠাকুর গড়বে কুমোর। বারোয়ারী পুজো হবে মণ্ডপে মণ্ডপে। জবা আবার নতুন করে ভাবতে বসল—কোন আদ্যিকাল থেকে এখানে বারোয়ারী পুজো হচ্ছে কে জানে। কত মানুষ এলো, কত ঠাকুর গড়া হল, কত মাটি এলো ঠেলায় করে; আশ্চর্য! এই সব সাত পাঁচ ভাবতে খুব ভাল লাগে জবার।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের কোলে হেলে পড়েছে। ধীরে ধীরে গলিটা আলোয় আলোয় সাদা হয়ে উঠল। এ গলিটার আলো যেন একটু

বেশী করেই জ্বলে। ল্যাম্পপোষ্টগুলো কাছাকাছি; বড় রাস্তার মোড়ের আলোটাও গলির অন্দরমহল পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। সন্ধ্যেতারা দেখা যায় না জবাদের ছোট্ট জানলার ফোকর থেকে।

জবা সন্ধ্যে দিয়ে শাড়ীটা পাল্টে এসে বসেছে চোলাই-এর কলসী নিয়ে। গলি দিয়ে মিছিল চলেছে উর্ব্বশীদের। ওরা মুখ টিপে হাসছে জবাকে দেখে। জবা মেঝের দিকে চেয়ে চেয়ে ওদের রং করা মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এ-দেখা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে; ও প্রতিদিন সন্ধ্যের বাতি জ্বললেই দেখে। এতে আর দুঃখ পায় না ও। কারণ জবা জানে, কোনও অন্যায় করছে না। বাঁচার তাগিদে ওরা যেমন সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, জবাও তেমনি বাঁচার তাগিদে ওর বাবাকে সাহায্য করতে এ-কাজটাকে বেছে নিয়েছে। তবুও জবা মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, মনে মনে এ কাজকে ও সমর্থন করে না কোন দিন। জবা জানে চোলাই বিক্রি করে ও সমাজের কোনও মঙ্গল করছে না, বরং সহজ সরল মানুষগুলোকে আরও সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ওপায় তো নেই। তা ছাড়া যারা এখানে আসে তারা অন্য কোথাও যেতে প্রস্তুত। তাদের নেশায় ঘুণ ধরাতে পারবে না ও।

রাম এসেছে দুচোখে আবেশ নিয়ে। পিঁড়িটা টেনে নিয়ে জবার সামনা সামনি বসেছে ও। জবা দেখছে দুচোখ ভ'রে। আজ রামকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে; কালো চোখ দুটোয় জবাকে আপন করে নেওয়ার আকুল বাসনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুজনে মৌন হয়ে ভাব বিনিময় করছে অনেকক্ষণ ধরে।

রাম জবার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

জবা সম্মতি জানায় ওর হাত দুটো রামের হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে দিয়ে।

নতুন খদ্দের আসে জবার কাছে অমৃতের সন্ধানে। জবা হাত সরিয়ে নিয়ে সরে বসে রামের কাছ থেকে।

জবা চোলাই পরিবেশন করে হাসি মুখে। ছন্দ-পতন ঘটে, মনে

মনে নবাগত খদ্দেরের উপর রাগ হয়। নতুন খদ্দের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাম বসে থাকে জবার মুখোমুখি। জবার চোখদুটো সত্যিই সুন্দর। রাম চেয়ে থাকে জবার চোখে চোখ মেলে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির নেমে আসে একটু একটু করে। জবা দু-গ্লাস এগিয়ে দেয় রামের দিকে। প্রতিদিনের মত আঙ্গুলে আঙ্গুলে কথা হয় ওদের। কারণ-সুধা নেমে আসে গলার ভেতর দিয়ে; গলার ভেতরটা জ্বালা করে উঠে। ওর মনটা ভরে উঠে কৃতজ্ঞতায়।

এবার যাওয়ার পালা; আজ অনেকক্ষণ রইল ও। রাম চলে যাচ্ছে। জবার মনটা রামের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে। কিন্তু না—মনটাকে ফিরিয়ে নিতে চাইল জবা। চোখ দুটো জলে ভ'রে এলো ওর। আবার কাল সন্ধ্যে, তার আগে আর দেখতে পাবে না জবা—ওর আপনজনকে।

রাম চলে গেল। আলোর রোশনাই নেমে এসেছে বড় রাস্তার উপর। পাশের যাত্রিনিবাসে বিয়ের আসর বসেছে; কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওখানে বিবাহবাসর। আলো দিয়ে সাজিয়েছে ঝুলবারন্দাটাকে। রাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ওর বিয়েতে হয়ত আলো জ্বলবে না; সানাই বাজবে না, শাঁখ বাজবে না একবারও। জবাকে ঘরে তুলতে পারবে কি ও! ঘর নেই রামের, আশ্রয় নেই—উরুক্রম মঠের আশ্রম ছাড়া। রাম এগিয়ে যায় দক্ষিণের মহাশ্মশানের দিকে। আলোর রোশনাই পড়ে থাকে পেছনে। রাম হাসে মনে মনে, ডোমের আবার বিয়ে!

জবার বাবা আজ দেরী করছে। বুড়োটাও এলো না আজ। জবা খিল এঁটে দেয় বারদোরে।

একুশ

উরুক্রম মঠের চাতালে গামছা বিছিয়ে শুয়ে রইল রাম। এতক্ষণ ঘুমে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু হায়, এখন আর ঘুম এলো

না। নানান চিন্তা-ভাবনা একসঙ্গে জড়ো হয়ে মাথার মধ্যে চক্কর খেতে লাগল। মানুষের জীবনে কত দুঃখ! এই দুঃখের বোঝা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। হাসে, কথা বলে। ক্ষণিকের সুখ মাঝে মাঝে সব দুঃখ কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। একটু একটু করে ভাবনার স্রোত অন্য পথে মোড় ঘোরে। জবা এক মুখ হাসি নিয়ে রামের মুখোমুখি হয়। এদিকে অন্ধকারটা বুনো গাছগুলোর আড়ালে জমাট বেঁধে আছে। চাঁদের আলো চোখে পড়ে না রামের। তারাগুলো চাঁদের আলোয় ঢাকা পড়েছিল। এখন বুনো গাছটার ফাঁক থেকে সপ্তর্ষি উঁকি মারছে এখানে। মনের আলমারিটা চেষ্টা করে খুলতে হল না. সীমাহীন ব্যথার মধ্যে থেকে জবা বেরিয়ে এসেছে এক মুখ হাসি নিয়ে। খবরের কাগজের একটা মাজনের বিজ্ঞাপনের ছবির মত ওর চক্ চকে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে ঠোঁটের ফাঁক থেকে। জবাকে দেখছে রাম; ওর বুকের ধমনীতে রক্তস্রোত দলা পাকিয়ে উঠে। মেঝেতে পেতে দেওয়া গামছাটা তুলে নিয়ে ও গা ঘসে নেয় খানিকটা। ঘুম আসে না কিছুতেই। মশার উৎপাত বেড়েছে। রাম গলির মোড়টায় গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। মেঘের পেছু পেছু চাঁদ চলেছে মেঘের ভেলায় চড়ে। মঠের লেড়ী কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একপাশে। জবার টুকরো টুকরো স্মৃতি মনের আনাচে কানাচে ঘুরে মরে। জীবনটাকে মনে হয় খেলাঘর। এই খেলা ঘরে মানুষ আসে দুদিনের খেলা সাঙ্গ করতে। প্রথমে ফুলের মতন ফোটে, প্রেমে ভালবাসায় চান করে—যৌবনে। আপনজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে কাঁদে। তারপর একদিন খেলা শেষ করে চলে যায়। রাম ডুব দিয়েছে জবার ভালবাসায়। মনটা ঘিরে রয়েছে জবাকে কেন্দ্র করে। জবা আড়াল করেছে ওকে। আকাশের মেঘটা জমাট বাঁধছে। চাঁদকে আড়াল করে রেখেছে। একটু বৃষ্টি হলে মন্দ হত না। খরার পরে বন্যা হত। রাস্তায় জল জমে যেত। মানুষের আনাগোনা কমত। মহাশ্মশানে মড়া আসত কম। রাম জবার ছোঁয়া লাগান গ্লাসে চোলাই খেয়ে পড়ে থাকত উরুক্রম মাঠের

চাতালে। অনেক দিন ভাল করে ঘুমুতে পারেনি ও। গা ভোর ঘুম হত। আর যদি জবা থাকতো চাতালের এক কোণে শুয়ে। ওর কাঁধের দিকটা খোঁপার নীচে থেকে মসৃণ পালিস করা।

একটু একটু করে আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। মেঘের ফাঁকে আবছা আলো। অন্ধকারটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কমলের দোকানের ঝাঁপটা খুলেছে। রাস্তার কলে জল পড়ে যাচ্ছে। রাম মুখ চোখ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে কমলের দোকানের ফাঁকা বেঞ্চটায় বসে। কমল বলে, কি-রে এত সকালে কি তোর সাধু বাবা চা খাবে? আমার চা তো আজকাল আর পছন্দ হয় না।

কমল উনুনে কয়লা দিয়ে কেটলীটা বসিয়ে দেয়।

রাম জবাব দেয়, না, সাধুর এখনও ঘুম ভাঙেনি। আমায় এক গ্লাস দাও।

সাত সকালে ডোমের মুখে চা তুলে দিলে—আজ আর খদ্দের জুটবে না। দাঁড়া আগে একটা বউনি করি।

রামের ইচ্ছে করল উঠে যায় এখান থেকে, পরক্ষণেই ভাবে, আর কোথাও দোকান খোলা পাবে না ও। রাম কমলের কথা হজম করে বসে থাকে। কাগজওয়ালা একটা বাংলা কাগজ দিয়ে যায় রামের কাছে। রাম কাগজের ভাঁজ খুলে ছবি দেখতে শুরু করে—না কোথাও কিছু নেই। এর মধ্যে তো আর কোনও নেতা মরেনি যে, ডোমের ছবি ছাপবে কাগজওয়ালারা। রাম কাগজটা আবার ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিয়ে পা তুলে বসে। হায়রে, জল ফুটছে সামনে; তবুও বউনি না হলে কমল রামকে চা দেবে না। আরও খানিক ধৈর্য ধরে বসে থাকে ও। একটা খদ্দের এসেছে, এ-পাড়ার জগন্নাথ পরামানিক। রামকে দেখে জগন্নাথ মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

কমল বলে, বাবুকে বসতে দে রাম। দেখছিস না খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে।

রাম বেঞ্চি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

কমল দু-ভাঁড় চা করে, প্রথম ভাঁড়টা জগন্নাথকে এগিয়ে দেয়।

জগন্নাথ চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে বেঞ্চে পা তুলে বসে খবরের কাগজের পাতা উলটায়।

রাম দোকানের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে গরম চা তারিয়ে তারিয়ে খায়।

চা-পর্ব শেষ করে রাম মঠে ফিরে এসে দেখে সাধু উঠোনে ঝাড়ু দিচ্ছে একমনে। রামকে দেখে সাধু বলে, সাত সকালেই কোথায় গিয়েছিলি? এখানটায় ঝাড়ু দিয়ে রাখতে তো পারিস। দেখছিস না গাছের পাতায় জায়গাটা ভরে গেছে।

রাম বললে, কাল সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। তাই একটু চা খেতে গিয়েছিলাম। দাও গুরু, আমি ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি।

আর ঝাড়ু দিতে হবে না। তুই বরং আমার জন্যে একটু চা এনে দে। আমারও ভাল ঘুম হয়নি। 'যা গুমোট পড়েছে। সকালে উঠে দেখি বেশ মেঘ করেছে। কিন্তু বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। সারাদিন গুমোট চলবে।

রাম কেটলী নিয়ে চা আনতে গেল। কমলের দোকানে এখন বেশ ভীড়।

রাম দাঁড়াল এক পাশে আর পাঁচটা খদ্দেরের পেছনে।

কমল একে একে সবাইকে চা পরিবেশন করে সাধুর কেটলীতে চা ভরে দিল।

চায়ের দাম মিটিয়ে রাম মঠে ফিরে এলো।

এর মধ্যে সাধু স্নান সেরে গুরুকে প্রণাম করছে।

রাম ঘরের বাইরে দালানে দাঁড়িয়ে সাধুকে দেখছে একমনে। সাধুর প্রতি ওর শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে উঠেছে একটু একটু করে।

সাধুর পুজো সাঙ্গ হল। রাম এবার চাতালে জুত করে বসল। ও একভাঁড় চা সাধুকে দিয়ে নিজেও নিল আরও একভাঁড়। সাধুর গ্লাসটা এখনও মাজা হয় নি। সময় পায়নি রাম।

সাধু কিছু বলার আগেই রাম বাজারের থলিটা নিয়ে বাজার করতে বেরিয়ে পড়ল,—এ ওর নিত্য কর্ম। বাজার সেরে এসে ও

সাধুকে রান্নায় সাহায্য করে। সাধু উনুন ধরিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে রামের সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করে। রাম অজানা অনেক কিছুই সাধুর কাছে জেনে নেয়। সাধুর উপদেশ মত ও চলে। সমাজ-সংসারে এই একটা লোককে রাম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এখানে ফাঁকি নেই একটুও।

রাম প্রতিদিনের মত নেড়া-পুলটা পেরিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর পাঁচটা বাজারযাত্রীর সঙ্গে। থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়; বাজার করে রাম। মাছ কেনা নিষেধ। সাধু মাছ খায় না। গুরুর আদেশ।

মেঘভাঙ্গা রোদ্দুরটা টাটিয়ে উঠেছে। ঘামে ভিজে উঠেছে রাম। ও বাজার সেরে কুটনো কুটতে বসেছে উরুক্রম মঠের চাতালে। উনুনে ভাত ফুটছে টগবগিয়ে। দেখতে দেখতে ভাত নেমে গেল। সাধু বললে, এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না রে। চল পালিয়ে যাই কোথাও।

রাম সাধুর মুখে এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে চমকে উঠে, ভাবনার বলিরেখা ওর কপালে ফুটে উঠে; বলে, অন্য কোথাও গেলে খাব কি? তাছাড়া তুমি যে বলেছিলে এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আজ হঠাৎ তোমার মনের এই পরিবর্তন কেন? আপনজনকে তুমি যে এখানেই রেখে গেলে।

সাধু জবাব দেয়, মনের দুঃখে কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে এলোরে; যার কেউ নেই, তার আবার পেছুটান কিসের? ছেলে-বৌকে এখানেই রেখে গেলাম। আমার আর কেউ রইল না। তবুও কেমন যেন একটা মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। আর মায়ায় জড়াতে চাই না রে; তুই সকালে ছিলি না, মনটা মোচড় দিয়ে উঠল, ভাবলাম, তুই বুঝি আমার ফেলে কোথাও চলে গেলি। রাতে তুই ছিলি না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝ রাতে কথার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দেখি, দু'জন মেয়েমানুষকে এনে চারজন মস্তান মঠের চাতালে বসে চোলাই গিলছে। মঠের চাতালে এ-দৃশ্যও

দেখতে হল। ধমক দিতে যে মেয়েমানুষটা চোলাই বেচছিল সে বললে, পুলের নীচে পুলিস এসেছে, এখুনি মাল নর্দমায় ঢেলে দেবে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মঠের পবিত্রতা এতে করে নষ্ট হচ্ছে। মঠে রাতে চোলাই বিক্রি হচ্ছে, দু-দিন পরে দেখব সাট্টার বোর্ড বসেছে। দিনকাল যা হল, আরও কত কি যে দেখতে হবে কে জানে। মনে মনে আবার ভাবি, ছেলে-গুলোকে দোষ দিয়ে লাভই বা কি? আমরা ওদের জন্যে একখানা ঘর দিতে পারিনে; খেলার মাঠ নেই কোথাও; চাকরি নেই—ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর বেশী ভাবনা চিন্তা করলে টগরের ছেলের মত গলায় দড়ি দেবে।

ভাতের ফেন ফেলতে ফেলতে সাধু আবার শুরু করল, হাঁ রে দেশটা হল কি বলতো? এমন করে তো চিরকাল চলতে পারে না; একটা কিছু ঘটবেই; একটা পরিবর্তন হবেই। এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চিরকাল চলে না। হয় ভালর দিকে যাবে, নয় তো চরম খারাপ, এসব তারই সংকেত।

রাম মাথা নীচু করে এ-সব শোনে, কোনও জবাব দেয় না।

দেখতে দেখতে আকাশটা গনগনিয়ে উঠল। রোদের তাপ বাড়ছে। সাধুর চোখ দুটো ওই গনগনে আগুনের সঙ্গে জ্বলতে শুরু করল। সাধু ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বেশখানিক স্তব্ধ হয়ে রইল, এই মরা দেশের মরা মানুষগুলো জাগবে কবে? লগ্ন যে বহে যাচ্ছে। আর সময় নেই; রুখে দাঁড়ানোর এই তো সময়। এই সাজান গোছান সমাজ ব্যবস্থার মেকী ঠাটটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এ দেশের মানুষ জন এখনও এগিয়ে আসছে না কেন? সাধু বুঝতে পারে না!

সাধুর কথাগুলো রামের মনে তালগোল পাকাচ্ছিল; জবাকে দেখে ও চমকে উঠে,—জবা তুই!

মধু তোমায় ডাকছে।

কেন রে?

টগরের ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে। টগরকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

তা আমি গিয়ে কি করব! আমার আর কিছু ভাল লাগে না। মানুষের দুঃখ দেখে দেখে আমি পাথর হয়ে গেছি। টগরের ছেলে মরেছে, ওর মরাই উচিত। যে মাকে বাঁচাতে পারে না, তার বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না। ও তবু তো মরল, আমার মত যারা ভীরু তারা মরতেও ভয় পায়। জবা তুই আমাকে ওখানে যেতে বলিসনারে; আমার মনের কথা তুই বুঝবি না। ওই মড়া-কান্না আমি রাতভোর শুনেছি। এখন একটু শান্তি চাইছি। আমায় আর ওখানে যেতে বলিসনা রে।

আগুন জ্বালান সূর্যের নীচে জবা স্তব্ধ বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল,—রামের মুখের দিকে তাকিয়ে। রামকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

জবা দাঁড়িয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল উরুক্রম মঠের চাতাল থেকে।

সাধু তরকারী বসিয়ে দিয়ে বললে, তোর একবার যাওয়া উচিত রাম; জবা ডাকতে এলো; মধু ডাকছে। টগরকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

রাম মাথা নীচু করে চাতালে বসে রইল খানিকটা। সাধুর কথা কোনও দিন অবহেলা করেনি ও। আজ সাধুর উপদেশও ভাল লাগছে না ওর।

রাম আরও খানিকক্ষণ টগরের ছেলেটার কথা ভাবল, মাকে বাঁচাতে পারেনি বলে ছেলেটা মরল।

রাম ছুটে বেরিয়ে গেল মঠ থেকে! ওরও চোখ দুটো জ্বলছে। অন্ধকারে যারা টগরের মাকে টাকা দিতে আসে, তাদের রক্ত—রামের হাত দুটো নিসপিস করছে। একটা কিছু করতেই হবে। ও টগরের ছেলেটার মত মরবে না, ছেলেটা মাকে বাঁচাতে পারে নি।

টগরের ছেলেটা জ্বলন্ত চিতায় শুয়ে। লাল আগুনের শিখার আলোয় জবাকে চেনা যায় না। ও টগরকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরও চোখ দুটো জ্বলছে।

টগরকে ধরে রাখা যায় না।

মধু আরও কাঠ গুঁজে দিচ্ছে চিতায়

বাইশ

সন্ধ্যে নেমে এলো আদিগঙ্গার ওপারে। সাধু প্রদীপ জ্বেলে দিল গুরুর ছবির পাশে ছোট্ট মাটির বেদীর উপরে। সাধু বসল ধ্যানে। চোখ বন্ধ করে ও গুরু প্রণাম শুরু করে দিল। পাড়ার কিছু মহিলা এলো গুরু প্রণামের সঙ্কল্প নিয়ে। ওরা এসে বসল—সাধুর পেছনটায়। সাধু অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে গুরুকে স্মরণ করল।

প্রণাম সেরে সাধু গুরুর ভজনা শুরু করল,—

"ভব সাগর তারণ কারণ হে।
রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন হে ॥
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

তব নাম সদা শুভদায়ক হে।
পতিতাধম মানব পাবক হে ॥
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে।
গুরুদেব কৃপা কর দীন জনে ॥"

সাধুর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ভজনা করল ভক্তি যোগে।

রাম দালানে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ভজনা শেষ হলে রাম সবার সঙ্গে প্রণাম করল গুরুকে।

সাধু প্রসাদ দিল সবাইকে।

রাম এবার পথে নেমে এলো।

মেয়েরা সাধুর কাছাকাছি বসে সুখ দুঃখের কথা পাড়ল সাধুর কাছে। সাধু সাধ্যমত উপদেশ দিল; সকলের জন্যে শুভকামনা করল গুরুর চরণে।

এবার সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত্তির ঘনিয়ে এলো উরুক্রম মঠের চাতালে। ভক্তবৃন্দ গুরু প্রণাম সেরে নিয়ে বিদায় নিল ওখান থেকে।

সাধু আবার ধ্যানে বসল, ঘন্টাখানেক ধরে মানুষের মঙ্গল কামনা করল মনে মনে। এ জীবনটা গেল বৃথাই, মানুষের এমন কি নিজেরও কোন কাজে লাগল না। সাধু ভাবে কেন এলো সে এ-পৃথিবীতে, কেনই বা মানুষ আসে এখানে, আবার চলে যায়; কিছুই তো থাকে না। ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম—পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে শরীরটা, আবার নতুন মানুষ জন্ম নেবে এখানে, চক্রাকারে চলেছে এই পৃথিবীর নিয়মের রাজত্ব। এর শেষ কোথায়? এত মানুষ আসে—আবার চলে যায়, কোথায় কে জানে, জানার উপায় নেই—কোনও মানুষ এর হদিস খুঁজে পায়নি আজও। একটা অব্যক্ত বেদনা জাগে নিজের পরিবারের জন্যে। এই পৃথিবীর মানুষগুলোর জন্যে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে সাধুর। সাধু আবার ভাবে—কার জন্যেই বা কাঁদছে ও।

সাধু চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রদীপের স্তিমিত আলো, ঘরটায় আলো-আঁধারের সৃষ্টি করেছে। সাধু ভেবে নিয়েছে ও একাই মনের সঙ্গে কথা বলল এতক্ষণ, কিন্তু না; পেছনে বসেছিল সামনের চুনশুরকির দোকানের মালিক অমূল্য বাবুর স্ত্রী অর্চনা।

সাধুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অর্চনা ছুটে এসে সাধুর পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

সাধু বললে, কর কি! আমি কারও প্রণাম নিই না।

অর্চনা বললে, বাবা বাঁচাও আমাকে, মুক্তির পথ দেখাও; আর যে পারি না।

সাধু অর্চনাকে পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে দালানে এসে দাঁড়ায়।

অর্চনা চৌকাঠ পেরিয়ে দালানে সাধুর সামনা-সামনি এসে দাঁড়ায়।

সাধু একটা আসন পেতে বসে, আর একটা আসন এগিয়ে দিয়ে

অর্চনাকে বলে, বস মা, বল তোমার কি হয়েছে? এ বয়সে মুক্তি চাইছ কেন? মুক্তির পথ যে আমি জানি না। সংসার অনিত্য জানি, কিন্তু মুক্তির পথ তো জানি না।

অর্চনা সাধুর মুখোমুখি বসে।

সাধু বলে, বল, কি তোমার দুঃখ।

অর্চনা বেশ খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকে; তারপর বলতে শুরু করে, আপনি আমায় বাঁচান ঠাকুর।

ঠাকুর উন্মুখ হয়ে রইল।

অর্চনা বলে চলল, লজ্জায় কাউকে কিছু বলিনি; শুধু নীরবে কেঁদেছি। আমার স্বামী মায়ের মন্দিরের পূব দিকে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা মেয়ে মানুষ রেখেছে। এ আমি জানতাম, দোকান বন্ধ করে ও রোজই মেয়েটার কাছে যায়; ফেরে রাত এগারটা নাগাদ। মাঝে মাঝে ঝগড়া করি, বোঝাই; কিছু কাজ হয়নি; কাল রাতে বাড়ী ফেরে নি। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল—ও কিছুই জানে না। আজ সকালে বাড়ী ফিরতে আমি একটু রাগারাগি করি। স্বামী বলে কি-না, 'মাগী তুই মর। তোর জন্যেই আমার যত জ্বালা।' আর সহ্য হয় না, এবার মুক্তি দাও ঠাকুর।

অর্চনা উঠে এসে সাধুর পায়ের কাছে মাথা ঠুকতে শুরু করে।

সাধু অর্চনাকে ধমক দিয়ে বলে, স্থির হও, অত চিন্তা করলে কিছুই হবে না। তোমার ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে তোমাকে বাঁচতে হবে। দেখছি কি করা যায়।

অর্চনা একটু আশার আলো দেখে। আবার সোজা হয়ে বসে চোখ মুছতে শুরু করে।

সাধু বলে, আজ থেকে স্বামীকে নতুন করে সেবা-ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা কর। আমি গুরুকে ডাকবো; তাঁর কাছে তোমার কথা বলব, নিশ্চয়ই একটা সুরাহা হবে। রাত হল, তুমি এখন বাড়ী যাও। ছেলেটাকে মানুষ করার চেষ্টা কর।

অর্চনা সাধুকে প্রণাম করে চলে গেল।

এদিকে রাম নেড়া পুলটার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাকে ভাবছে। ওর নিটোল চাহনি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে; টগরের জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠে। একটা তাগিদ আসে ও-পাড়া থেকে। রাম নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সাধুর ঘরে ওর প্রবেশ নিষেধ; জবার ঘর ওর জন্যে খোলা।

রাম পায়ে পায়ে জবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানটায় এখন বেশ্যাদের ভীড়ে গম্ গম্ করছে।

একজন চোলাই খেয়ে খিস্তি মারছে — গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে।

বুড়োটা ছেলের হাত ধরে রিকসায় উঠছে।

রাম ভীড় ঠেলে গলিটায় ঢুকে পড়ে।

তেইশ

এতক্ষণ বৈশাখী-ঝড় বহে যায় জবার বুকের উপর দিয়ে। শেষ খদ্দেরটা বিদেয় হয়েছে ছেলের হাত ধরে। জবা চোলাই-এর কলসীটা ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে যায়। বারদোর বন্ধ করতে যাবে, আধো আলো আধো অন্ধকারে ভূতের মত রামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জবা প্রথমটায় চমকে উঠে; তারপর একগাল হেসে বলে, বাবাঃ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, এসো ভেতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এতক্ষণ দেখে দেখে সবে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। বাবার ফিরতে রাত হবে।

জবা হারিকেনটা উসকে দিয়ে চোলাই-এর কলসীটা আবার বাইরের ঘরে নিয়ে আসে। বলে, বস, আসছি।

রাম পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে। জবাকে দেখলেই ওর বুকের ভেতরটায় দপ্‌দপানি শুরু হ'য়ে যায়। শিরার ভেতর রক্ত টগবগিয়ে উঠে। রাম চোখ বন্ধ করে জবাকে ভাবতে বসেছে। ও যদি এখন রামের বুকের কাছে কান পেতে থাকতো, শুনতে পেত রামের বুকের স্পন্দন; কিন্তু তারও উপায় নেই। এখুনি হয়ত ওর

বাবা রা রা করে ছুটে আসবে। না! এভাবে আর চলা যায় না। জবাটা গেল কোথায়? ওদিকে যে রাত একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। চাঁদের আলোটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে।

রাম ডাকলে, জবা!

জবা জবাব দিলে, যাচ্ছি!

জবা শাড়ীটা পাল্টে নিয়ে মুখটা শুকনো গামছায় ঘসে নিয়ে একটু পাউডার দিচ্ছে। আঃ মিনসের আর তর সয় না!

এক ঝলক লাবণ্য দিয়ে জবা অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে এলো।

রাম জবাকে দেখলে দু-চোখ ভ'রে।

জবা ঠাট্টা করে বললে, অমুন শুকুনের মত চেয়ে আছো কেন?

আজ রাত্তির যদি এখানে থাকতে পারতুম, তোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতুম বুকের উপর; তোরই পালঙ্কে।

তা হলে শ্মশানে মড়া পুড়োতো কে?

তুই আমায় সব সময়েই আঘাত দিয়ে কথা বলিস জবা! ডোমের চাকরি আমারই কি ভাল লাগে রে? কিন্তু কি করব বল! এ ভাগাড়ে যে এটুকু জুটেছে এটাই যথেষ্ট। শ্মশানে মড়া পোড়ালে দেখতে পেতিস—এ দুনিয়ার হাল। তা ছাড়া তুইও তো জানিস, মায়ের মুখে দুটো অন্ন তুলে নিতে না পেরে টগরের ছেলেটা গলায় দড়ি দিল। যাক্ ওসব কথা; এলুম একটু আনন্দ করতে; কিন্তু তুই কি-না মনটাকে দিলি বিষিয়ে; জবা, এ জীবন আর টানতে পারি না; হাঁরে, আর কত দিন! আয় না এবার ঘর বাঁধি।

থাক্ খুব হয়েছে; জবার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; এই নাও, ও চোলাই-এর গ্লাসটা রামের হাতে তুলে দিল।

রাম গ্লাসটা পাশে রেখে বললে, থাক পরে খাব। নেশা করতেও আর ভাল লাগে না।

সে কি? অমৃতে অরুচি!

না রে; ও খেলে আর কথা বলতে পারব না; মনটা অন্যদিকে

চলে যাবে। নেশার ঘোরে অনেক বাজে বকে যাব। তোকে একটু প্রাণ ভ'রে দেখেনিই। তোর নেশায় এখন আমি বুঁদ হয়ে আছি। অন্য নেশা ভাল লাগে না।

তবে কি ঢেলে রাখব?

না, থাক; একটু পরে খাচ্ছি। না খেলে রাতে আবার ঘুম আসবে না; সারাদিন মড়া ঠেলতে পারব না।

জবা গ্লাসটা তুলে নিয়ে আবার রামের হাতে দেয়; রাম ওটা গলায় ঢেলে দিয়ে আবার গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয় জবার দিকে।

জবা আরও এক গ্লাস তুলে দেয় রামের হাতে।

কি-রে জবা, এত রাত্তির পর্যন্ত দোকান খুলে রেখেছিস যে, পুলিস এসে হামলা করবে।

জবার বাবা ছন্দ পতন ঘটায়। রাম দ্বিতীয় গ্লাসটা গলায় ঢেলে দিয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়।

রামের পা দুটো টলছে। নেশাটা জমার আগেই পাতলা হয়ে এলো।

জবার বাবা দরজায় খিল এঁটে দিল।

চব্বিশ

দেখতে দেখতে রাত গাঢ় হয়ে এলো। আকাশে চাঁদ ছিল না। হয়ত কৃষ্ণপক্ষ। না, তা ঠিক নয়। আকাশটা মেঘলা করে আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে। গুমোট আকাশ। হয়ত বৃষ্টি হবে। নয়ত ঝড়। ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কালো মেঘের পাহাড়কে। দু-ফোঁটা নামলে মন্দ হত না। অনেকদিন হয় গেল, বৃষ্টির দেখা নেই। যা গরম; বৃষ্টি একটু দরকার। ধুলোগুলো মরবে। টালি নালায় জল বাড়বে। মশা পালাবে এখানে ওখানে। মঠের গাছটায় ফুল ধরবে।

অন্ধকার গলিটা পেরিয়ে রাম মঠের আঙ্গিনায় প্রবেশ করল।

সাধু এতক্ষণে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে।

দালানটা গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় রাম।

মাতুরটা পেতে শোয়ার তোড়জোড় করে। কিন্তু ঘুম আসে না চোখে। ওর নেশাটা কেটে গিয়েছিল জবার বাবাকে দেখে। লোকটাকে দেখলেই ভয় করে রামের। জল্লাদ চোখে দেখেনি রাম, কিন্তু মনে হয় ওর চেহারাটা ঠিক জল্লাদের মত।

জবাকে মনে পড়ে যায়। জবা সত্যিই ভালবাসে ওকে। কিন্তু ঘর বাঁধবে কবে?—রাম জানে না। এ চাকরি ছাড়া সম্ভব নয়। আর একটা পাবে কোথায়? রাম মনে মনে ঠিক করে, এবার কোন বড় লোকের মড়া এলে ও একটা পয়সাও নেবে না, শুধু বলবে, একটা চাকরি জোগাড় করে দিন; আর পারছি না মড়া ঠেলতে; মনটা পাথর হয়ে গেছে।

রাম ঘুমিয়ে পড়ে।

বৃষ্টি নামে অঝোরে।

বৃষ্টির ছাঁটে রামের পিঠটা ভিজে যাচ্ছে। তবুও ঘুম ভাঙ্গে না রামের। জবা বুকের উপর শুয়ে আছে। রাম আদর করছে জবাকে। ও জোর দিয়ে বলছে,—এবার এ-চাকরি ছেড়ে দেবেই। বাবু বলেছে, একটা ভাল চাকরি দেবে।

জবা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ওর সারা গা বেয়ে ঝরছে শ্রাবণের ধারা!

জবা ডাকতে পারছে না কিছুতেই। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ও।

রাম শুয়ে আছে। মুখ নড়ছে। কথা সরছে না।

সাধুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কান্নার শব্দে সাধু চমকে উঠে। বৃষ্টির দাপট একটু কমেছে।

সাধু দরজা খোলে। মেঘ ডাকছে। বিজলী চমক দিচ্ছে। অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো এসে পড়ছে জবার ভিজে মুখে। রামের সারা গা ভিজে গেছে জলের ছাঁটে। জবা পাশে বসে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সাধু বলে, মা তুই ! এত রাতে। কি হয়েছে ?

জবাব দেয় না ও। কান্নাটা আরও বেড়ে যায়।

সাধু ডাকে, এই রাম উঠে পড়। দেখ কে এসেছে।

স্বপ্নের মায়াজালে রাম নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।—জবা ওর বুকের কাছটায়। সাধুর চিৎকারে ওর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। রাম চোখ চেয়ে দেখে জবা বসে আছে পাশে ; দালানটার ধারে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে, ওর সারা শরীর জলে ভেজা। সাধু দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

রাম উঠে বসে, বড় বড় চোখ মেলে ছোট শিশুর মত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে জবার দিকে।

জবা রামের পায়ে আছড়ে পড়ে।

রাম জবাকে তুলে ধরে। কোনও কথা বলতে পারে না ও।

সাধু আবার প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা ? খুলে বল।

জবা ভিজে আঁচলে চোখ মুছে নেয়, বলে, বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ও।

রাম প্রশ্ন করে, কেন ?

জবা জবাব দেয় না ; আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে আবার কান্না শুরু করে দেয়।

রাম আবার প্রশ্ন করে, কি হয়েছে ?

সাধু বলে, কি হয়েছে খুলে বল।

জবা এবার জবাব দেয়, ও একটা টিকলি দিয়েছিল, বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে আমি ওটা পরেছিলাম। বাবা ঘুমোয়নি, দেখে ফেলেছে। বাবা বললে, এটা কে দিয়েছে বল ? আমি বলিনি। বাবা খুব মারলো। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজায় খিঁল এঁটে দিল। আমি কত করে ডাকলাম, বাবা তবু দরজা খুলল না। বৃষ্টি হচ্ছিল। গলিটায় কেউ ছিল না। আমি বাধ্য হয়ে এখানে চলে এলুম।

সাধু জবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বেশ করেছিস মা। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোর কোনও ভাবনা নেই। তুই ঘরে গিয়ে

আমার একখানা কাপড় পরে শুয়ে পড়। এখনও রাত বাকী। আমি দালানে রামের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেব। তারপর সকাল হলে কি করা যায় ভেবে দেখা যাবে।

পঁচিশ

রাতটা ফিকে হ'য়ে এসেছে। দু-জনের কারুর মুখে কথা নেই। জবা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মেঝেতে বসে আছে। মাঝে মাঝে জবার ফুঁপিয়ে উঠা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে দালানে।

আকাশের রঙ্ বদলাচ্ছে।

রাম ভিজে কাপড়টা পাল্টে চায়ের কেটলি নিয়ে চা আনতে গেল।

সাধু গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসেছে।

তখনও দোকান খোলেনি একটাও।

রাম ফুটপাথের ধারে বসে আছে একা। ভাবছে—আকাশ পাতাল। কোথায় যাবে ও। মঠে তো আর জবাকে রাখা যাবে না। ভাবনার শেষ নেই ওর। তবুও ভরসা একটা আছে। সাধুকে সবাই ভালবাসে। বিশ্বাস করে। একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

বিষণ্ন সকাল। পৃথিবীটা দয়ামায়াহীন একটা জ্বলন্ত শ্মশান। হায়রে পালঙ্কে জবাকে নিয়ে শোয়ার সাধ হয়েছিল ডোমের। জবা এসেছে। কিন্তু কোথায় শুতে দেবে তার কোনও ব্যবস্থা নেই রামের।

আকাশটা পরিষ্কার। ধোয়া মোছা সকাল। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। রাস্তাটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে; ঠিক যেন হেমন্তের মাঠে ঝরে পড়া শিশিরের জলে ধোয়া কাস্তের মত বাঁকা চক্‌চকে। রামের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।—হায়রে! জবা তুই এলি, কিন্তু তোকে বসতে দেওয়ার মত এক ফালি জমি আমার নেই। আমি যেন এই পৃথিবীর কোনও যাযাবর প্রাণী। এসেছিলাম এই পর্যন্ত। আমার চাল নেই, চুলো নেই। তুই এলি, তোকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। তোকে বুকে করে রাখব, কিন্তু কোথায়? জানি না।

আকাশটা আরও সাদা হয়ে গেছে। মানুষ চলতে শুরু করেছে—এপথ বেয়ে। সাধু হয়ত পুজোয় বসেছে। জবা পেছনে বসে এখনও কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ওর মনের সাধ পূর্ণ হল না। ডোমের চাকরি ছাড়ার আগেই ও ডোমের ঘরণী হতে চলে এলো।

রাম কেটলি ভর্ত্তি করে চা এনেছে।

সাধুর পুজো সারা হ'য়ে গেছে।

জবা সাধুর দেওয়া একটা ধুতি পরে ঘরের কোণে বসে আছে একা। ও মুখ দেখাবে না কাউকে।

রাম ভাঁড়ে চা ঢালছে।

সাধু বললে, রাম তুই চা-টা খেয়ে নিয়ে শ্মশানে চলে যা, মধু খবর পাঠিয়েছে—মড়া এসেছে। আমি আজ বাজার করব। জবা এসেছে, একটু ভাল মন্দ রান্না করতে হবে তো।

রাম জবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইল।

সাধু বাধা দিয়ে বললে, তুই কাজটা সেরে আয়, আমি বরং বাজার করার সময়ে ওর বাপের সঙ্গে কথা বলে নেব। তোকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। ও এখন আমার অতিথি। যা করার আমায় করতে দে।

রাম প্রথমে একটু থমকে দাঁড়ায়। গরম চা-টা একটু একটু ক'রে খায়, তারপর ধীর পদক্ষেপে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যায়। ওর চোখদুটো আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠে। সাধুকে প্রণাম জানায় মনে মনে।

নেড়াপুল, রাজপথ, তারপরে সরু গলি পেরিয়ে রাম মহাশ্মশানের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে।

ছোট্ট খাটিয়ায় মড়া শুয়ে আছে। চাদর দিয়ে মড়ার দেহটা ঢাকা। শববাহকদের একজন গেছে বামুন ডাকতে। একজন ডাক্তারের কাছে।

রাম তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে চাইল। নিজেই কাঠ নিয়ে এলো কাঁধে করে। চুলি সাজিয়ে দিল যত্ন করে।

ডাক্তার এলো ডেথ্-সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে।

ওদেরই একজন মড়ার মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিল।

ডাক্তার হুকুম দিল মড়া পোড়ানোর।

দু-জনে কঙ্কালসার সরু দেহটা চুলিতে শুইয়ে দিল; মুড়ি-পোড়া বামুন মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করে দিল,—

"ওঁ গয়াদিনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বারাঃ॥
কৌশিকীং চন্দ্র ভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপ প্রণাশিনীং।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডকীং সরযূং পনসং তথা॥
বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথা॥"

ওদিকে সাধু চলেছে বাজারে।

জবার বাবা আসছে এপারে মঠের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত। সারারাত ঘুমোয়নি ও। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে।

এদিকে রাম চোখ দুটো ভাল করে মুছে নেয়। মড়ার চেহারাটা ওর চেনা বলে মনে হল।

আবার চোখ দুটো মুছে নিল রাম। এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল মড়াটার দিকে। তারপর চিৎকার করে মড়ার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। —মা মা, তুমি চলে গেলে! আর আমি তোমার চুলি সাজিয়ে দিলাম। না না, মাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। মাগো মা। রাম চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। ওর কান্না আর থামে না।

ডাক্তার চলে যাচ্ছিল, ফিরে এলো রামের গলা শুনে। ডাক্তার একটু স্থির হয়ে দাঁড়াল। বললে, রাম উঠে পড়; এ তোর মা নয় রে।

রাম কেঁদেই চলেছে,—টগরের ছেলেটা ওর মাকে বাঁচাতে পারেনি; ও নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। মা, তুমি মরলে, তোমাকে আমি

বাঁচাতে পারলুম না। তোমায় বাঁচানোর জন্যে কত চেষ্টা করেছি, কোথাও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারিনি। শেষে এই ডোমের চাকরি। মড়া পোড়ানোর পয়সা তোমায় কিছুতেই পাঠাতে পারিনি মা।

ডাক্তার এবার রামের দুটো হাত ধরে টেনে তোলে। বলে, রাম তোর কি মাথা খারাপ হল! ডোম কখনও মড়া দেখে কাঁদে। তা ছাড়া এ-তোর মা নয়। এ যে বামুনের ঘরের বিধবা।

ওদেরই একজন ডাক্তারকে কি যেন বোঝাতে চাইল।

রাম ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে উঠল চিৎকার করে,— ডাক্তারবাবু আমিও যে বামুনের ছেলে।

আদিগঙ্গার ওপারে ফায়ারিং-এর আওয়াজ হচ্ছে। মারমুখি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস গুলি চালাচ্ছে!